গরীব বা হতভাগার কলিকাতা

সুকুমার সিকদার

।। পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতি ।।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হল ৮ কোটি ২ লক্ষ ২০ হাজার। তাদের মধ্যে মহিলা হল ৪৮.৩ শতাংশ, অর্থাৎ নারী পুষের অনুপাত হল ৯৩৪, যেখানে ভারতের গড় অনুপাত ৯৩৩। পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৬০.২২ শতাংশ, আর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার গড় হার ৬৯.২২ শতাংশ। অন্যদিকে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে সমগ্র ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মাথাপিছু আয় এই রাজ্যে ছিল সবচেয়ে বেশী (কিন্তু বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ম স্থানে)।

স্বাধীনতার পরে এই শহরের বাইরে ভারী শিল্পকারখানা স্থাপিত হলেও তাদের প্রধান কার্যালয় যেমন ছিল কলিকাতায় তেমনি হাসপাতাল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী প্রধান দপ্তরগুলি এখানে থাকার জন্য শহরের প্রাধান্য ক্ষুন্ন হয়নি। তারপর পাটশিল্পের প্রাধান্য হ্রাস, মাশুল সমীকরণ নীতি (১৯৫৬), বিদ্যুৎ সমস্যা, বামপন্থী শ্রমিক অসন্তোষ, বাংলাদেশের যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলনের মতো অজস্র সমস্যা ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মেদণ্ড ভেঙে দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের 'দারিদ্র' সমস্যার সরকারী চিন্তাভাবনার কথা মনে করা যেতে পারে। ১৯৬২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের নিযুক্ত স্টাডি গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬০-৬১ সালের মুল্যস্তরের ভিত্তিতে মাসে ২০ টাকা ভোগব্যয় ধরা হল মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে। পরে পরিকল্পনা কমিশন একটি "Task Force on the Projections of Minimum needs and Effective Consumption Demand" গঠন করে। এই টাস্কফোর্সই দারিদ্র্য রেখার ধারনার সুপারিশ করে। তাদের মতে গ্রামাঞ্চলে ২,৮০০ এবং শহরাঞ্চলে ২,১০০ ক্যালরিখাদ্যশক্তি হল মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন। এই খাদ্যশক্তি সংগ্রহ করতে ১৯৭৯ - ৮০ সালের মূল্যস্তরে গ্রামে ৭৬ টাকা ও শহরে ৮৮টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। ১৯৯৩ - ৯৪ সালের মূল্যস্তরে সেই খরচ ধরা হল যথাক্রমে ২২৮.৯০ টাকা এবং ২৬৪.১০ টাকা।

অন্য এক হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে মাথাপিছু বার্ষিক ২৮৯ টাকা ভোগব্যয় ধরে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা ৬৫ শতাংশ থেকে কমে ৫০.৬ শতাংশ হয়েছিল (মিনহাস)। দৈনিক গড়ে ২,২৫০ ক্যালরি খাদ্যশক্তির প্রয়োজনীয়তা ধরে পি. ডি. ওঝা ১৯৬৭-৬৮ সালে দেখেছেন, গ্রামের ৪০ শতাংশ শহরে ৫০ শতাংশ লোকই দারিদ্র্যরেখার নীচে বাস করে। অন্য এক গবেষক ঐ সময়ের মূল্যস্তরে গ্রামে মাসিক ১৫ টাকা ও শহরে ১৮ টাকা ভোগ ব্যয় ধরে দেখেছেন যে ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের গ্রামের ৪২ শতাংশ ও শহরের ৫৫ শতাংশ লোকই দারিদ্র্যরেখার নিচে বাস করত (পি কে বর্ধন)। ঐ একই মূল্যস্তরে মন্টেক সিংহ আলুওয়ালিয়ার হিসেবে ১৯৫৬ - ৫৭ সালে ভারতের গ্রামের ৫৪ শতাংশ লোকই ছিল দরিদ্র। ১৯৬০ - ৬১ সালে তা কমে ৪০ শতাংশ হলেও আবার ১৯৬৬ - ৬৭ সালে তা বেড়ে ৫৭ শতাংশ হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই সব গবেষকদের মধ্যে যেমন মতপার্থক্য রয়েছে, তেমনি মাপকাঠি নিয়েও প্র তোলা যায় অনেক।

আর ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৩-৭৪ সালের মূল্যস্তরে গ্রামে ৪৯ টাকা ও শহরে ৫৭ টাকা মাসিক ভোগব্যয় ধরে দেখেছেন ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ দারিদ্র্য ৫৬ শতাংশ থেকে কমে ৩৯শতাংশ হয়েছে আর শহরে তা কমেছে ৪১ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ। তাদের মধ্যে ইউপি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে দরিদ্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আবার ১৯৯৭ সালে সরকারী আরএকটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে ১৯৯৩ - ৯৪ সালে ভারতের দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৬ শতাংশ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৯৯ - ২০০০ সালে দেশের ২৬ শতাংশ লোক মাত্র দারিদ্র্যরেখার নিচে বাস করে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু অন্য একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যরেখার নীচে বাস করা শতকরা ৪৪.৩৫ শতাংশ লোক। কিন্তু গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ২৭ ভাগই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছে এবং তাদের জীবনধারণের প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা, যেমন – বাসগৃহ, পানীয়জল, সড়ক যোগাযোগেরও কোন সুবিধা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবী করছেন যে দারিদ্র্য দূরীকরণের নানা কর্মসূচীর মাধ্যমেতাঁরা দারিদ্ররেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ৪৪.৩৫ শতাংশ থেকে ৩৬.৬৮ শতাংশ নামিয়ে আনতে পেরেছেন। (পঞ্চায়েত ওগ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; Paper on Centrally sponsored schemes)

সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যদূরীকরণ সম্ভব না হলেও স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির বিকাশের দিকটি বিশ্লেষণকরলে দেখা যাবে যে ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশের সার্বিক অর্থনীতি বেশ উন্নতির দিকে গেছে। এই সময়ে জাতীয় উৎপাদন বেড়ছে, ৪.৬ গুণ, শিল্প উৎপাদন ১২ গুণ, খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৭০ গুণ। শিশুমৃত্যুর হার ১৭০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮৯ শতাংশ, মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়েছে ৪১ থেকে ৬১ বছর। কিন্তু অন্যদিকে মোট দারিদ্র্যের সংখ্যা বেড়েছে দেশের ১৯৫১ সালের মোট জনসংখ্যার সমান, বেকারের সংখ্যা ১০০ গুণ, দেশের ১/৩ অংশ লোক ভুগছে অপুষ্টিতে, ৬০ শতাংশ লোকেরা এখনও পানীয় জল পায়নি, ৪৮শতাংশ লোক নিরক্ষর। বেড়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য। অর্থাৎ, এই শিল্পায়ন, এই উন্নয়নের সুযোগ সব সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। কর্নাটক, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট যেখানে অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরদূরদৃষ্টির অভাবে পশ্চিমবঙ্গও বিহারের মতো পিছিয়ে গেছে।

দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে এই রাজ্যের মোট শ্রমিক - কর্মীর সংখ্যা ২,১৯,১৫,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে হয়েছে ২,৯৫,০৪,০০০। অর্থাৎ দশ বছর বৃদ্ধির হার ৩৪.৩৬ শতাংশ। এই সময়ে মহিলাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১.২৩ শতাংশ। সংখ্যার হিসেবে তা ৩৬.৬২ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০.০৩ লক্ষ। ন

ারী শ্রমশক্তি মোট মহিলাদের জনসংখ্যার তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গেছে। পুষ শ্রমশক্তির বৃদ্ধি হয়েছে ৫১/৪ শতাংশ থেকে ৫৪.২৩ শতাংশ। জন্মহার অত্যধিক বৃদ্ধি পেলেও এই সময়ে কর্ম - অক্ষম মহিলাদের সংখ্যা ৮৮.৭৫ শতাংশ থেকে কমে ৮১.৯১ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু কর্ম - অক্ষম মহিলাদের সংখ্যা ৮৮.৬ শতাংশ থেকে ৪৫.৭৭ শতাংশ। [NABARD State Focus Paper, West Bengal, 2005-06] কিন্তু অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন বিগত দশ বছরে বেকারসমস্যা বেড়েছে তীব্রগতিতে।

আবার গ্রামীণ জনবিন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গে মোট গ্রাম ৪১,২০০ টি, ব্লক ৩৪৫টি। মোট ৮,০২,২০,০০০ জন লোকের মধ্যে শহরবাসী জনতা ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ২.৪৭। এখানে কৃষিতে নিয়োজিত শতকরা ৫৫.৭০ ভাগ লোক। মোট কৃষিযোগ্য ভূমিকর পরিমাণ ৬০১৫ Ha আর রাড্যের মোট আয়তন ৮৮৭৫ Ha । মাথাপিছু গড় GDP হল, ১,৭৫৬ যা অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু সম্প্রতি এক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে কলিকাতার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিবিল্বর যে কোন শহরের তুলনায় বেশী। শূন্য থেকে শু হয়েছে বলেই চোখে পড়ার মতো এই খবর। যে প্রাচীন ধারার চটকল, রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির বদলে অত্যাধুনিক কম্পিউটর ও ইলেকট্রোনিক্স শিল্পের আবির্ভাবের পর থেকে একটি পরিবর্তন চোখে পড়ছে। শহরের সম্প্রসারনের সাথে বহুতল বাড়ি নির্মাণ, ভোগ্য পণ্যের আগ্রাসী বিজ্ঞাপন প্রমাণ করে যে ৮০-র দশকের দুঃস্বপ্নকাটিয়ে শহর আবার নতুন দিকে যাত্রা করছে। কিন্তু সম্পদ বন্টনের তীব্র বৈষ্যমের জন্য সাহেব টাউন আর ব্ল্যাক টাউনের বদলে পুরো কলকাতা শহরটিই বিভাজিত হয়ে গেছে বস্তির এবং প্রাসাদের শহরে।

।। বস্তির শহর ।।

শহর পত্তনের প্রথম থেকে উত্তরে দেশীয় জনতা, দক্ষিণে ইংরেজ আর এদের মধ্যে পার্ক স্ট্রীট - এর কাছাকাছি এলাকায় সাহেব ও অ্যাংলো গ্রুপের লোকদের বসতি নির্দিষ্ট হয়ে গেল। সাহেবদের আরাম আয়েশের যোগান দিতে, সাহেবদের খিদমত করতে যে ভৃত্যকুল নিয়োজিত হয়েছিল, তারা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকত বলে সাহেবপাড়ার আশেপাশেই তাদের থাকার আস্তানা গজিয়ে উঠেছিল। হতদরিদ্র লোকের এই আবাসই পরে বস্তি বলে চিহ্নিত হল। S K Munsi লিখেছেন, "…slums were needed for servicing the mansions and their occupants, or how else could the rich get servants, …cooks, …labour was abundant and cheap and it paid to keep slums with in the city, in fact nearer to the mansions" [Calcutta Metropolitan Explosion : Its nature And Roots] আদিপর্বেই ক্যামাক স্ট্রীটের বামুন বস্তির তৈরী হওয়ার সেটাই মুখ্য কারণ।

এভাবে একই শহর বিসদৃশ দুইটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে গেল। হ্যামিলটনের বিবরণে (East India Gazetteer, Vol-1, P-316) পাওয়া যাচ্ছে "In 1717 Calcutta exhibited a very different appearance….the house, which were scattered about in clusters of ten or twelve each and the inhabitants chiefly husbandmen… the house were surrounded by puddles of water." [Captain Alexander Hamilton]"

জন্মের আদিপর্ব থেকেই কলিকাতায় অবিরল একমুখী জনস্রোত কখনো বন্ধ হয় নি। বেরিয়ার লিখেছিলেন, বাংলাদেশ হল "the kingdom which has a hundred gates open entrance, but not one to departure" (Ref : T B Lahiri: Calcutta : A Million City with Million Problem; foot note in Calcutta Slums).

স্টাটিস্টিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুসারে ১৭৫১ থেকে পরবর্তী সত্তর বছরে এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ৫২, পরবর্তী ৪৫ বছরে বৃদ্ধির হার শতকরা ১১০, এবং তার পরের ৩৫ বছরে বৃদ্ধির হার শতকরা ৫২। জনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল বহিরাগতের স্রোত। বিংশ শতাব্দীর শুতেও এই বহিরাগতের সংযোজন ছিল অব্যাহত। সেনসাস রিপোর্টের ছবিটি চোখে পড়ার মতো—

সেনসাস	শহরের মূলবাসী	শতকরা হার	বহিরাগত	শতকরা হার	মোট
১৯১১	৬,৩৪,৭৩৮	৬৩.৬	৩,৯৭,২৭৪	৩৯.৮	৯,৯৮,০১২
১৯২১	৭,০৬,১২২	৬৮.৪	৩,৭১,৫৭৫	৩৬.০০	১০,৩১,৬৯৭
১৯৩১	৭,৮৪,৩৮৭	৬৮.৭৫	৩,৭৮,৭৭৬	৩২.২০	১১,৪০,৮৬২
১৯৩১	১০,৬৬,১১৫	৬৮.৫১	৬,৯০,৫৫০	৩৯.৮	১৭,৩০,০৭৪

তথ্য (Calcutta Slums, P-3)

অন্য একটি তথ্য থেকে বৃহত্তর কলিকাতার মোট লোকসংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে—

বৎসর	লোকসংখা
১৯০১	৯,৪৯,১৪৪
১৯১১	১০,৪৩,৩০৭
১৯২১	১১,৩২,২৪৬
১৯৩১	১২,৬০,৭০৯
১৯৪১	২১,০৮,৮৯১
১৯৫১	২৫,৪৮,৬৬৭
১৯৬১	২৯,২৭,২৮৯

(তথ্য Calcutta in 20th Century P-2)

বলা বাহুল্য, এত লোকের থাকার জন্য শহরে বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাদের অধিকাংশকেই বস্তির নোংরা পরিবেশে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল।

বাস্তবে বস্তি কাকে বলা হবে, এ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি আছে। The Calcutta Corporation investigation Commission মন্তব্য

করেছেন, বস্তির "definition does not convey the kind of thing that a bustee is," (Report 1948-49, Page – 148; Calcutta in the 20th Century গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ-২০১)। বস্তির সংজ্ঞা নানা জনে নানাভাবে দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালের Slum Act অনুসারে বস্তি হল 'those areas where buildings are in any respect unfit for human habitation' আর ১৯৮০ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল আইনের মতে বস্তি হল – 'an area of land not less than 700 square metres occupied by, or for the purpose of, any collection of huts or other structures used or intended to be used for human habitation', অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্টাটিস্টিকস অর্গানাইজেশনের মতে, যে এলাকায় "having 25 or more katcha structures, mostly of temporary nature of 50 or more households residing mostly in katcha structure huddled together or inhabited by persons with practically no private latrine and inadequate public latrine and water facilities."

কলিকাতায় slum শব্দটি বস্তির সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হলেও দুইয়ের অর্থ কিন্তু এক নয়। বলা যায় বস্তি আর বসতি বা কলোনি বেদখলী জমি, আয়তনে ৭০০ বর্গ মিটারের কম নয় এমন স্থানের ঘুপটি ঝুপড়ি কুঁড়ে ঘরকেই বলে বস্তি। Slum এর বাসিন্দারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষ শ্রমিক। তাদের থাকার জায়গার উপর একটি অধিকার স্বীকৃত।

শহরের বস্তিগুলিকে বিশেষজ্ঞরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এর প্রথমগুলি অবশ্যই আড়াই তিনশত বছরের পুরানো এবং এগুলি শহরের মধ্যভাগেই অবস্থিত। শহরের জন্মলগ্নের সাথে সৃষ্টি সেবক এবং নগরোন্নয়নের কুলিমজুরের আবাসস্থল হিসেবেইএগুলি গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এল শ্রমিককুল আর তাকে কেন্দ্র করে শহরের নানা অঞ্চলে নতুন নতুন বস্তিগুলি গড়ে উঠেছে। শিল্পশ্রমিক ও শিল্পকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে যে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টার্সিয়ারী সেক্টর গড়ে উঠেছিল, সেইসব অবলম্বন করেই এই বস্তির অবস্থান। প্রথম যুগে চটকল, ইঞ্জিনীয়ারীং শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ডাক যোগাযোগ, টেলিগ্রাম লাইনস্থাপন, রেলপথ নির্মাণ ও ডকের কাজে হাজার হাজার লোক কলিকাতায় এল। বহিরাগত শ্রমিক, কুলি, ধাঙ্গর এখানের প্রধান বাসিন্দা।শিল্পায়নের প্রথম পর্বে বাঙালীরা এই সব কাজকে নিজেদের মর্যাদাহানিকারক বলে মনে করত বলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও কিছুসংখ্যককাজে পূর্ববঙ্গের দরিদ্র লোকেরা একচেটিয়া ভাবে বহাল হয়েছিল। এই বস্তিবাসীর মধ্যেও তাই সব ধরনের লোকের মিশ্রণ দেখা যায়। এর পরে শহরে ট্রামলাইনের পত্তনের সাথে সাথে বিহারের লোকেরা এর প্রতি আকৃষ্ট হল। শহরে কুলি, রিক্সাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ঠেলাওয়ালাসহ ছোটখাট দোকানদারী করার জন্যও বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক লোকের আগমন হয়। দেশোয়ালী সূত্রে তারাও পুরাতনদের সঙ্গে ঐ সব এলাকায় স্থান দখল করে নেয়।

বাঙালীরা যেমন কেরাণীর কাজে প্রথম থেকে বেশী আগ্রহ দেখাল আর বিহারীরা কুলি, মুটে, রিক্সাচালক ও কারখানার কাজে যোগ দিল। উড়িষ্যা থেকে আগতরা পাল্কীবেহারা, গৃহকর্ম, প্লাম্বিং, গ্যাস ও বিদ্যুতের কাজে সাফল্য দেখালো। আবার ইউপি, বিহারের মুসলমান শ্রমিকেরা চামড়া, সাবান ও রং - এর কারখানায় যোগ দিল। এভাবে প্রথম দিকের বস্তিগুলিতে জাতিধর্ম ভাষার বেশ কিছু বিভাগ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু শহরে স্থানের অভাবে বস্তিগুলির মধ্যের দূরত্ব খুব বেশী নয়। ট্যাংরার ১৫,০০০ লোকের হরিজন বস্তির পাশেই তাই তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের বসতিপূর্ণ মুসলিম বস্তি দেখা যায়। অবশ্য তারা সব একই ধরনের পেশায় নিয়োজিত। ১৯৬৮ সালে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ অঞ্চলের একটি বস্তিতে সার্ভে করেছিল অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। সেখানে ৬১টি একতলা ঘরে বসবাস কারি মোট লোকের সংখ্যা ছিল ২৪৫১ জন। তাদের বেশীর ভাগ বাঙালী হলেও বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষা ও নেপালের লোকও কম নয়। রাজমিস্ত্রীর কাজ, লেদমেশিনের কাজ, আয়া, ছোট দোকানদারী, হকারী করে তাদের জীবন চলে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনদিকেই শহরের আকারও বেড়ে বেড়ে যেতে লাগল। কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের রেখে তার চারিপাশে সাধারণ লোকের কলোনিগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকল। এভাবে বেহালা, বালিগঞ্জ, বেলেঘাটা, নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলের দিকে শহর সম্প্রসারিত হতে থাকল।

বস্তিপত্তনের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে। তখন বাঙালীদের উপর অভিশাপের মতো চাপিয়ে দেওয়া হল ভগ্নদেশের স্বাধীনতা। সঙ্গে এল প্রাণঘাতী হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা। গান্ধী - নেহে নীতির জন্য এবার শুধু হিন্দুদের চাপ বাড়লো। বস্তির লোকদের ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার হাউসিং এস্টেট তৈরী করে দিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপর্যাপ্ত। দলে দলে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী পর্যাপ্ত পুর্নবাসন ব্যবস্থার অভাবে তারা যেখানে কোন ফাঁকা জমি পেয়েছে, রাতারাতি সেখানেই বাঁশ খুটি দিয়ে ছোট ছোট টালি দরমার ঘর তৈরী করে স্থান দখল করে নিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে আর একপর্ব শরণার্থী আগমন এই বস্তিপত্তনকে ক্রমশ প্রলম্বিত করতে থাকে। ব্যক্তিগত জমিজমা আর বিশেষ না থাকায় সরকারী খাসজমি, রেলের জমি, এমন কী, রেললাইন, রাস্তার ধারে শহরের মধ্যবর্তী খালের ধারে জমি দখল করে এই তৃতীয় পর্যায়ের বস্তির পত্তন হয়। এদের বস্তি না বলে কলোনী বলে চালানো হল। রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে, রেললাইনের পাশে এই বসতিগুলির বাসিন্দারা পূর্বপাকিস্তান এমন কী বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত লোক। ১৯৮১ সালের এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে শহরের মধ্যেই ২৬০ টি উদ্বাস্তু কলোনীতে চার লক্ষেরও বেশী লোক বাস করছে। এছাড়াও ফুটপাতে বসবাস করছে আরও দু লক্ষের বেশী উদ্বাস্তু। বস্তিবাসীর সংখ্যাও হিসাব করা হচ্ছে পঁচিশ লক্ষেরও বেশী ('Calcutta's Economy, 1918 – 1970, The fall from grace' by Omkar Goswami Calcutta The living City- তে সংকলিত নিবন্ধ) এখন শহরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকই ২,০১১ টি রেজিস্টার্ড এবং প্রায় ৩,৫০০টি আনরেজিস্টার্ড বস্তিতে বসবাস করে। ভারতের বোম্বে শহরে বস্তিবাসীর হার প্রায় শতকরা পঞ্চাশ, আর সেখানের একমাত্র ধারাবি বস্তিতেই থাকে প্রায় ৫ লক্ষ লোক। সেই একই সময়ে কলিকাতা শহরে বস্তিবাসীর হার প্রায় ৩৩ শতাংশ এবং দিল্লিতে ৩০ শতাংশ (তথ্য MITFV P-135)

।। বস্তির পরিবেশ ।।

কলিকাতার বস্তিবাসীদের প্রধান সমস্যা বাসস্থানের; অতি নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রায় অমানবিক জীবনযাপন করে তারা। পানীয় জলের অভাব, অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধযুক্ত খোলা নর্দমা, মলমূত্র ত্যাগের অব্যবস্থা, আলো - বাতাসহীন প্রায়ান্ধকার নীচু ঘর, দুই সারি ঘরের মধ্যে অপরিসর কাঁচা রাস্তা এবং সেই রাস্তার উপর শিশুদের মলমূত্র ত্যাগ ও কাঠ বা কয়লা দিয়ে খোলা আকাশের নীচে রান্নার ধোঁয়া, অভাব-অভিযোগ হেতু পরিবারে নিত্যকলহ ও সামান্য কারণে ঝগড়া, চীৎকার, অশ্লীল শব্দপ্রয়োগ, আর তাই নিয়ে মারামারি; যা কখনো হত্যার পর্যায়ে পৌঁছে যায় সব মিলিয়ে এক দমবন্ধপরিবেশে কালগত পাপক্ষয়। ছোট জায়গায় অনেক লোকের আবাস বলে অল্পবয়সেই শিশুরা জীবনরহস্যের অনেক কিছু জেনে যায়, ফলে অল্পবয়সেই যৌনতার বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং নানা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিদেশীরা এই নগরের সমালোচনায় সোচ্চার এই বলে যে এখানের মোট জনসংখ্যার প্রায় একের - তিন অংশ লোক বস্তির এক কামরার ঘরে অস্ব

াস্থ্যকর জঘন্য পরিবেশে বাস করে। ১৯১৪ সালে CIT এর মুখ্য বাস্তুকার E. P. Richards হিসেব করে দেখেছিলেন মধ্য কলিকাতার প্রায় ৮০০ একর জমিতে অতি জঘন্য বস্তিতে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক বাস করছে। সেই বাড়িগুলি মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত বলে তা ভেঙে দেওয়া উচিৎ বলেও মন্তব্য করেছিলেন।

"...at least 2,50,000 people were living in house that under any ordinary bylaws would be condemned and closed as unfit for human habitation. Nearly all the working class families can afford but a single room, in which they have to live, eats, sleep, propagate their species and die....."

এই বস্তির জন্য কলিকাতার জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশী, প্রতি বর্গমাইলে ১,০২,০১০ জন (জন ১৯৬১ - ৬৩ সালের কথা), সেখানে দিল্লিতে হল ৪১, ২৮০ জন আর নিউইয়র্কে ২৭,৯০০ জন। (Calcutta the City Revealed; Geoffrey Moorhouse) । লেখকের বর্ণনার কালে কলিকাতায় মোট লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষের মতো। তার মধ্যে ১/৩ অংশের বেশীই বস্তিতে বাস করে বলে তাঁর মনে হয়েছে। যদিও সরকারী মতে এই সংখ্যা ছিল মাত্র সাত লক্ষ। ১৯৫৭ সালের আর একটি হিসাব অনুসারে এই শহরের ৭৭শতাংশ পরিবার বাসস্থানের জন্য গড়ে মাত্র ৪০ বর্গফুট স্থান পাচ্ছে। আর পরিবার পিছু কামরার সংখ্যা ১.৫৫টি। (Calcutta the City Revealed) মাত্র এই সময়ে প্রায় নয় লক্ষ লোক ৪৫,০০০ বাড়িতে থাকত, অর্থাৎ ঘর পিছু লোকসংখ্যা ২০ জন। ১৯৭৮ সালের একটি সমীক্ষায়ও দেখা গেছে যে ৯০ শতাংশ বস্তির লোকই দুই তিন প্রজন্মের পরিবার মিলে একটি ঘরে থাকে এবং অন্যদের সাথে রান্নাঘর পায়খানা বাথম যৌথভাবে ব্যবহার করে। আবার ৭৮ শতাংশ লোকই ৬ টি পরিবার মিলে একটি ঝুপড়ি ভাগ করে থাকে। কাশীপুর বস্তিতে দেখা গেছে ৫১শতাংশ ঝুপড়িতেই ৫টি করে পরিবার ভাগাভাগি করে থাকে। খিদিরপুর বস্তিতেও একই অবস্থা। গড়ে ১১০ বর্গফুটের একটি ঘরেই ৯০ শতাংশ লোক সপরিবারে বাস করে।

কলিকাতার বস্তিবাসীদের অন্তত শতকরা চল্লিশ ভাগই কমপক্ষে দুইপুষ ধরে বস্তিতে বাস করছে। তারা এসেছে কলিকাতার সন্নিহিত প্রদেশগুলি থেকে। ইদানীং তারা নানা ধরনের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজকর্ম করে বলে তাদের গড় মাসিক আয় মাত্র ৫০০ - থেকে ১,৭০০ টাকার মধ্যে। পরিবার পিছু লোকসংখ্যা গড়ে ৫/৬ জন। ফলে অধিকাংশ পরিবারই দারিদ্র্যরেখার নিচে বাস করে। পুষেরা শারীরিক পরিশ্রম, রিক্সাটানা, দর্জি, ফুটপাতে দোকানদারী, হকারী, বাজারে সব্জী ও মাছ বিত্রি, অফিসে পিওন ও আর্দালী, দ্বারোয়ান, ক্যুরিয়ার সার্ভিসের কাজ এবং মেয়েরা হাতের কাজ এবং বেশীর ভাগই পাশের এলাকায় ঝি - এর কাজ করে। কিছু লোক ইদানীং গৃহনির্মাণ, রং মিস্ত্রি, ছুতোর, প্লাম্বিং ও ইলেকট্রিকের - এর কাজ করে। এদের পরিবারের মাসিক আয় সাধারণ এক থেকে দুই হাজারের মধ্যে। শতকরা হিসেবে দেখা গেছে যে বস্তির ৩১ শতাংশ লোক কারখানায় ও দৈনিক মজুরের কাজ করে, ২৩ শতাংশ লোক নানাবিধ হাতের কাজে নিয়োজিত এবং ২৩ শতাংশ লোক খুচরো ব্যবসা ও চাকুরীদ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

লক্ষ্য করে দেখা গেছে, ফার্নিচার, হোসিয়ারী দ্রব্য, চামড়ার জিনিষ, ঠোঙ্গা তৈরী, ব্যাগ তৈরী, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, রবারের জিনিসপত্র নির্মাণের কারখানাগুলি Slum এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে মূলত অফুরন্ত শ্রমিকের জোগান ও কম মজুরীর জন্য। ফুটপাতের বাসিন্দারা একটু একটু আর্থিক সুবিধা পেলে প্রথমে বস্তিতে সংসার পাতে এবং পরে বস্তি ছেড়ে চলে যায়। অনেক রিক্সাওয়ালা প্রথম এসে ফুটপাতে থাকতে শু করলেও ত্রমে ত্রমে পয়সা জমিয়ে কলোনিতে স্থান করে নেয়।

।। বস্তির জনবিন্যাস ।।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শহর এলাকাগুলিতেই রয়েছে বস্তি। সংখ্যার হিসেবে তা মোটেই কম নয়। কেবলমাত্র কলিকাতা শহরেই রয়েছে প্রায় ৫,০০০ টি বস্তি। পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় সব শহরগুলি মিলিয়ে লোকসংখ্যা সাকুল্যে ১,৫১,০৬,২৬৭ জন। এদের মধ্যে বস্তিবাসীর সংখ্যা হল ৪০,২৭,৮৬৩। শতকরা হিসেবে মোট জন সংখ্যার ২৬.৬৬ শতাংশ। বর্তমান কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে মোট জনবসতি হল ৪৫,৮০,৫৪৪ জন। এদের মধ্যে বস্তিবাসীর সংখ্যা হল ১৩,৯০,৮১১ জন। অর্থাৎ , কলিকাতায় বস্তিবাসীর হার রাজ্যের গড়ের চেয়ে বেশী, মোট জনসংখ্যার ৩২.৫৫ শতাংশ। তার কারণ, কর্মসংস্থানের জন্য বহিরাগতদের লক্ষ্য বরাবরের লক্ষ্য কলিকাতা। কলিকাতার তুলনায় হাওড়া রাজ্যের গড়ের চেয়ে বেশী, মোট জনসংখ্যার ৩২.৫৫ শতাংশ। কলিকাতার তুলনায় হাওড়া শহরে (পৌরসভার এলাকায়) বস্তিবাসীর সংখ্যা কম, মোট জনসংখ্যার মাত্র ১১৭২ শতাংশ। বলা বাহুল্য, বৃহত্তর কলিকাতার সমগ্র এলাকা, যার লোক সংখ্যা এক কোটির বেশী ধরা হয়, সেই এলাকার বস্তিগুলিকে এর মধ্যে ধরা হয় নি।

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কলিকাতার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেই বস্তিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। ট্যাংরা - তিলজলা ওয়ার্ডটির সমস্তটিই একটি বস্তি বলে ধরা যায়। এখানে মোট জনসংখ্যার ৯৯.৯৮ শতাংশই বস্তিবাসী। পর্যায়ত্রমে এর পরে আসে নারকেলডাঙ্গা (ওয়ার্ড নং ২৯) ৯৮.৮০ শতাংশ, মেটিয়াবুজ (ওয়ার্ড নং ১৩৭) ৯৮.৩৫; করেয়া - তিলজলা (ওয়ার্ড ৫৬) ৯১.৯৭; গার্ডেনরিচ - বন্দর - পশ্চিমে (ওয়ার্ড ১৩৪) ৯৭.৮৫; মেটিয়াবুজ - গার্ডেনরিচে (ওয়ার্ড ১৩৫) ৯০.৩০ শতাংশ ইত্যাদি। আর এই সংখ্যা সবচেয়ে কম হল এন্টালীতে (ওয়ার্ড ৫৪), মোট জনসংখার ২.৪৫ শতাংশ। লক্ষ্য করার বিষয় হল, কলিকাতার উপকণ্ঠে বাবুদের নগরী সল্টলেকের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আবাসিকই বস্তিবাসী। মোট জনসংখ্যা ১,৬৭,৮৭৮ -এর মধ্যে বস্তিবাসীই হল ৪৯,১৭৩ জন, অর্থাৎ ২৯.৩০ শতাংশ। (সেনসাস রিপোর্ট ২০০১)।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের আরও কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। শহরগুলিতে এমনিতে নারীপুষের অনুপাতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যেখানে নারী - পুষের অনুপাত ৯৩৪, সেখানে শহরে এই অনুপাত ৮৫৪ মাত্র এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, বস্তিবাসীদের মধ্যেই এই অনুপ্ত আরও কম। আর কলিকাতায় যেখানে নারীপুষের গড় ৮২৮, সেখানে বস্তি এলাকায় মাত্র ৮০৬। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে অবাঙালী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সমস্ত রাজ্য জুড়েই এই অনুপাত আরও অনেক কম। যেমন, টিটাগড়ে ৭৯১, চাঁপদানীতে ৭৪৪, রিষড়ায় ৭২১, সমগ্র হাওড়া শহরে ৭৭৭। কলিকাতার ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো (ওয়ার্ড নং ৪১) ৪২৩ (৪৭৭), মুচিপাড়া (ওয়ার্ড নং ৪৯) ৪৩২ (৪৩৫), বউবাজার - হেয়ারস্ট্রীট (ওয়ার্ড নং ৪৬) ৩৩৬ (৪৫৪, গার্ডেনরিচ - পোর্ট (ওয়ার্ড নং ৮০) ৩৭০ (৫৯০) মাত্র (এখানে বন্ধনীর ভিতর মোট জনসংখ্যার তুলনায় নারীর গড় হিসাবে অনুপাত দেখানো হল। সম্ভবত এইসব এলাকাগুলির বস্তিতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির লোকজন বেশী থাকে যাঁরা এখানে কাজকর্ম, খুচরো ব্যবসাপত্র ও হকারী করে জীবিকানির্বাহ করে এবং পরিারবর্গ দেশে রেখে নিয়মিত টাকাপয়সা দেশে পাঠায়। ফলে এই এলাকায় গণিকালয়গুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় কয়েকটি এলাকার বস্তি, যেমন বেহালা (ওয়ার্ড - ১৩১), কসবা (ওয়ার্ড ৯১), কসবা - যাদবপুর (ওয়ার্ড ৯২) এলাকাগুলিতে মলিহাদের অনুপাত গড় অনুপাতের অনেক বেশী। এগুলির অনুপাত হল যথাত্রমে ১০৯২ (৯৪৮), ১০০৯ (১০০২), ১১০২ (১০৩০)। রেসেনাস রিপোর্ট ২০০১)

রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বিশেষত পূর্ববঙ্গ থেকে যারা কলিকাতায় এসেছিল, সেই পরিবারের মহিলারা ছোটখাট হাতের কাজ বা লোকের গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত হয়ে গুমটি বা বস্তিতে বসবাস শু করল। এদেশের লোকেরা যে ধরনের কাজকর্মকে তাদের মর্যাদার উপযুক্ত বলে মনে করতেন না, বহিরাগত পুষেরা সেসব

কাজ ধরে সাময়িকভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে লাগল। দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে ২,৫৮,০০০ উদ্বাস্তু কলিকাতায় এসে পৌঁছাল, ১৯৪৮ সালে সেই সংখ্যা পৌঁছে গেল ৫,৯০,০০০-এ। ১৯৪৭ সালের কলিকাতার জনসংখ্যার ২৬.৯ শতাংশই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু উদ্বাস্তু। এর ফলে প্রধান সমস্যা হল বাসস্থানের। যে স্থানে যে ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল রাতারাতি তা দখল করে কলোনি বানিয়ে ফেলল এই সর্বহারা শ্রেণী। ১৯৪৯ সালে আবার খুলনার দৌলতপুর, খালিসপুর, ঢাকার মহম্মদপুর প্রভৃতি বিহারী মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র হলে নতুন করে উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। ১৯৫১ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে কলিকাতার শহরের মাত্র ৩৩.২ শতাংশ মানুষ জন্মসূত্রে এই শহরের, বাড়ি সবাই বহিরাগত। এই বহিরাগতদের যারা সঙ্গতিসম্পন্ন তারা শহরের মধ্যবিত্ত আবহাওয়ায় মিশে গেল। গরীবদের বেঁচে থাকাটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিল। পরিবারের সবাই মিলে পরিশ্রম করে কায়ক্লেশে দিন চলতে লাগল। এরই মধ্যে কেউ কেউ সন্তান সন্ততিদের পড়ালেখা শিখিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেরা উদ্বাস্তু জীবনের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, বেঁচে থাকার সংগ্রামে অন্য একটি দল মিশে গেল বস্তিজীবনে, শহরের ফুটপাতে কিংবা শহরতলীতে। যারা প্রতিষ্ঠিত হল, তারা কলকাতার মূল নাগরিকদের যুগপৎ ঈর্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে রইল অনেক দিন ধরে। কিন্তু সে পর্ব শেষ হল এক সময়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগতরা ক্রমে রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতিক প্রশাসনে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করতে শু করলে এই বিভেদ ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। এভাবেই কলিকাতা মহামানবের মিলনমেলায় পরিণত হল।

১৯৬১ সালের হিসাব অনুসারে কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা ৮৪ শতাংশ, মুসলমান ১৪ শতাংশ। আর এই ১৪ শতাংশ এর মধ্যে ৭০ জনই অবাঙালী মুসলমান, বাঙালী ২০ শতাংশ। ও বাকীরা গুজরাটী, মালায়ালী ও রাজস্থানী। ঘোড়া, চামড়া, ফল, মাংস, ওস্তাগর, বাদ্যযন্ত্র, সানাই, ব্যাণ্ড, আরদালী বাবুর্চি, খানসামা, দফতরী প্রভৃতি কাজে এই সব মুসলমানরা খুব আগ্রহ দেখিয়েছে। মহানগরেতপশিলী জাতির অনুপাত ৬.৪৫ শতাংশ এবং তপশীলি উপজাতির হার ২ শতাংশ। মোট জনতার ৫.৭৬ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। শিশুমৃত্যুর হার ৪৪ শতাংশ, জন্মহার ১৭.৩ শতাংশ ও মৃত্যুহার ৭.১ শতাংশ (সেনসাস ২০০১)।

।। বস্তির উন্নয়ন ।।

শহর পত্তনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই বস্তিবাসীদের নিয়ে সমস্যার শেষ ছিল না। ঔপনিবেশিক ঝা চকচকে শহরের খাঁজে খাঁজে চক্ষুশূলের মতো এই দীর্ণজীর্ণ বস্তি কারই বা ভালো লাগে! দারিদ্র্যহেতু চোরছ্যাঁচোড় ছিনতাইবাজের যেমন আখড়া এই বস্তি, তায় শহরে জনতার নিরাপত্তা। দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগব্যাধি মহামারীর উৎসব এই বস্তিগুলেক নির্মূল করাই সরকারী নীতির অঙ্গ ছিল। কিন্তু শহরজীবনের সুখসুবিধা, পরিষেবা জোগানের কথা ভাবলে বস্তিবাসী ছাড়া শহরজীবন অচল। তাই বস্তি তোলার বদলে ক্রমশ বস্তিবাসীদের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা নিয়ে চিন্তাভাবনা শু হল। দেখা গেল যে দারিদ্র্য আর দুঃসহ পরিবেশের জন্য অপুষ্টিআর সংক্রামক রোগব্যাধি বস্তিবাসীদের চিরসঙ্গী। শিশুমৃত্যু ও প্রসূতির মৃত্যুহার অতি বেশী। শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১০০। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য আন্ত্রিক, জণ্ডিস টাইফয়েড, ভাইরাল ফিভার, টিবি ধরনের রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। সাধারণ লোকের চেয়ে বস্তিবাসীদের মধ্যে চর্মরোগ দ্বিগুণ, হৃদযন্ত্রের রোগ আড়াই গুণ,শ্বাসজনিত দুর্বল গঠন, রিকেট ও পোলিও রোগী অত্যধিক। ১৯৭৯ সালে ৬০,০০০ বস্তিবাসী ও ২৯,০০০ কলিকাতার সাধারণ মানুষের মধ্যে সি এম ডি এ এক সমীক্ষা করে দেখেছিল যে বস্তিবাসীদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা খুবই কম, সাধারণ মানুষেৰ মধ্যে জন্মহার যেখানে ৩.৩ শতাংশ, বস্তিবাসীদের ভিতর তা ৪ শতাংশ।

সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হার অনেক কম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখনও আফশোস করে বলেন, এখানের ৩০ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। পঞ্চমশ্রেণী থেকে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ছুটের সংখ্যা ২৯ লক্ষ (২০০২ সালে, (দৈনিক স্টেস্টসম্যান; ৯৯-২০০৫)। বস্তিতে যে তার হার আরও দুঃখজনক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়, মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার নগণ্য। এই যদি বর্তমানে চিত্র, তখন কার প্রকৃত অবস্থা তা হলে কি ছিল?

ব্রিটিশ ভারতে বস্তির দারিদ্র্য নিয়ে অনেক কুমীরের কান্না দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ কিছুই হয়নি। যদিও নগরপত্তনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে সাধারণ নাগরিকদের পরিষেবার প্রাটি কিছুটা এগিয়ে যেতে থাকল। ১৭২৭ সালে মনোনীত একজন মেয়র ও নয়জন আলরম্যান নিয়ে প্রথম গঠিত হল কর্পোরেশন। ১৮৪৭ সালের আইন প্রণয়ন করে সাতজনের মধ্যে কর্পোরেশনের ৪ জন সদস্যকে নির্বাচনের ব্যবস্থা হল। ১৮৭৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে কাশীপুর চিৎপুর, মানিকতলা কলিকাতা কর্পোরেশনের আওতায় এল, টালিগঞ্জ যুক্ত হল আরও পরে। এভাবে বাড়তে বাড়তে এখন পুরসভার আয়তন হল ৩৯.৯২ বর্গমাইল বা ১০৪ বর্গ কিমি।

১৮৭৬ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা ৭২ জন কমিশনারের পদ গঠিত হয়। তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হল ২/৩ অংশ। তখন থেকে পাতাল ড্রেন, নির্মাণ পচা জলের পুকুর ডোবা বন্ধকরা ও জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ শু হল।

১৯০২ সাল থেকে কলিকাতা কর্পোরেশন আগুন নেভাতে রাস্তা ধূতে এবং নর্দমা ও নালী সাফ করতে অশোধিত গঙ্গার জলের যোগান দিচ্ছে। মল্লিকঘাট ও ওয়াটগঞ্জ পামপিং থেকে দৈনিক ৯০ মিলিয়ন গ্যালন জল আর জল সরবরাহ করা হয় ১৯৬৩ সালে কলেরার আক্রমন ঠেকাতে এই জলে ক্লোরিন মেশানো শু হয়। তখন ক্লোরিন বাবদ খরচ হত বছরে তিন লক্ষ টাকা।

কলিকাতা নগরোন্নয়নের অন্যতম বাধা হল অর্থের অভাব। প্রায় বিনাখরচে পরিষেবা, বিনামূল্যে অঢেল জলের হরিলুট আর কোন নগরে নাই। ফলে দুর্বল পরিষেবার অভিযোগ শুনতে হয় পুরসভাকে। তাই 'ফেল কাড়ি মাখো তেল' তত্ত্বে ঝিাসী হয়ে ক্রমে কর আদায়ও বাড়তে থাকে পরিষেবার বাড়তি দাবী নিয়ে। কিন্তু অন্যান্য শহরের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। ১৯৭২ সালেও পুরসভা সম্পত্তি, লাইসেন্স, ব্যবসা প্রভৃতি বাবদ কর আদায় করে মাত্র ১৩ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালের হিসেব অনুসারে বোম্বাই শহর জনপিছু ৫৪ টাকা হিসেবে করধার্য করে যেখানে বছরে ৩.৫০ কোটি টাকা বছরে নগরোন্নয়নের খাতে খরচও হচ্ছে অতি সামান্য, বছরে মাথাপিছু ১.৫০ টাকা মাত্র। রাজনৈতিক বিরোধিতায় জলের উপর কর বসানোর প্রচেষ্টা বানচাল হয়েছে। দেশের প্রধান প্রধান সব নগরেই জলব্যবহারের জন্য মাশুল গুণতে হয় নাগরিকদের।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পশ্রমিকদের জন্য ভর্তূকি দিয়ে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা শু হল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ ছিল ১৯ কোটি টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বস্তি উন্নয়নের জন্য ২৯ কোটি, চতুর্থ পরিকল্পনায় একটি অর্থনিগম তৈরী করে তার মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকা, পঞ্চম পরিকল্পনায় ১০৫.০৫ কোটি এবং পরের পরিকল্পনায় ১৫১.৪৫ কোটি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৬৯.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। রাজ্য সরকারও ১৯৫৮ সালে বস্তিবাসীদের জন্য আইন করে ড্রেন, পানীয় জল, সেনিটারী ব্যবস্থার উন্নতির কর্মসূচী গ্রহণ করল। কিন্তু তাতেও সদর্থক কোন উন্নতি দেখা যায় নি। ঝি স্বাস্থ্যসংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে কলিকাতা নগরপরিকল্পনা সংস্থা গঠিত হলে ক্রমশ বস্তিভিত্তিক সার্ভে শু হয়।১৯৭০ সালে সি এম ডি এ গঠিত হলে কেন্দ্রের বরাদ্দ, রাজ্যের অনুদান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ ও অনুদান নিয়ে বস্তি উন্নয়নের নানা কর্মসূচী গৃহীত হয়। এর ভিতর আবাসন নির্মাণ, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট তৈরী, আলোর ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থপরিষেবা উল্লেখযোগ্য।

সি এম ডি এ কাজ শু করার সময়ে তারা বলেছে যে তারা কলিকাতায় ১,৫০০ বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১২ লক্ষ লোকের পানীয় জল ও স্যানিটারী পায়খানার ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছে। সি এম ডি এ-র দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৯৭৭-১৯৮১ এই পাঁচ বছরে নগর উন্নয়নে যে ২৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল তার মধ্যে কলোনী এলাকা উন্নয়নে ২৮ কোটি এবং বস্তি উন্নয়নে ২১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

আমাদের পরিকল্পনার রূপকারগণ প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বস্তিজীবনের অবসান চাইলেও পরে মত পরিবর্তন করে ক্রমশ বস্তিউন্নয়নের কথা ভাবতে লাগলেন। Environment Improvement in Urban Sector Scheme (EIUS) ১৯৭৪ সাল থেকে বস্তি উন্নয়নের কাজ করে অনেকটা সাফল্য পেলেও নতুন নতুন বস্তিগড়ে ওঠার পথটি তারা বন্ধ করতেপারে নি। শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণে ত্ত্বব্ধনস্প্রপ্ত ব্দপ্তত্তপ্প ড্ডন্দ্বন্দ্বপ্তস্সম্মপ্পন্দ্বব্ধ ত্নজ্পস্নব্ধজ্জপ্পপ্পন্দ্ব ছত্ত্বত্রড্ডত্নগ্ন -ও বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন নতুন বস্তি গজিয়ে ওঠার ফলে সরকারী সুযোগসুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় সর্বদাই অপ্রতুল। ফলে বস্তিজীবনে অশিক্ষার অন্ধকার যেমন থেকে যাচ্ছে, তেমনি পরিবেশের প্রভাবে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে মাদকসেবন, ইভ - টিজিং সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবুও বস্তির লোকেরা শহর উন্নয়নের কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। তাদের ঠিকানা স্থায়ী বলে তারা ভোটদাতা হিসেবে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সবিশেষ গুত্ব পায়। ফলে পানীয় জল, নিকাশিব্যবস্থা, বিদুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবার কিছুটা তাদের কাছেও পৌঁছায়। অগ্নিকাণ্ডে বা ঝড়ে তাদের বস্তির কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে সাহায্যের হাত তাদের দিকে এগিয়ে আসে। রেজিস্টার্ড বস্তিগুলির বাসিন্দাদের তাদের বসবাসের স্থানের উপরে কিছুটা আইনগত অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু জবরদখল করা রাস্তার পাশের, খালের ধারের বা অন্য কারো জায়গা দখল করে রাখা বস্তিবাসীদের সে ধরনের কোন অধিকার নাই। তবে ইদানীং রাজনৈতিক কারণে নেতারা এই দখলকারীদের প্রতি বেশ সহানুভূতি দেখানোর ফলে দীর্ঘকাল বসবাস হেতু একধরনের অবৈধ অধিকার তৈরী হয়েছে। ইদানীং বালিগঞ্জটালিগঞ্জ রেললাইনের ধারে বস্তি অপসারণ করায় হাইকোর্টের আদেশ কার্যকরী করতে বাসিন্দাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে।

।। দৈবদুর্বিপাক ।।

সেকালের কলিকাতায় অনেক খড় ও গোলপাতা ও টালির চালার ঘর থাকার জন্য ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যেত। এখন যেমন আগুন লেগে সামান্য সময়ের মধ্যেই বস্তির বাঁশ, দরমা, পলিথিন শিট দিয়ে তৈরী হাজার হাজার ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়, ১৭৮০ সালের ২৪ শে মার্চ শুক্রবার এমনই ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে জানবাজার থেকে কলিঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় আধাক্রোশ এলাকার পনেরো হাজার কুড়ে ঘর অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। /বড়ন্দ্ব ব্ধড্ডব্ধত্তড়ন্দ্বস্ত্ত ড়ত্তব্ধব্দ স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ত্রব্ধনল্লন্দ্বব্দ স্তুস্পপ্পস্মাস্পব্দন্দ্বস্ত্ত প্পস্পব্দব্ধ স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ব্দব্ধজন্দ্বন্দ্বব্ধব্দ, ত্রস্তুত্তনস্তুন্দ্ধব্ধপ্তত্রস্ত্ত ন্তুন্দ্ধস্তুন্দ্রজন্তু ন্দ্রনজন্দ্বব্দ ত্রুব্ধপ্তপ্তন্তু স্মাজস্পস্তুত্তন্তুন্দ্বস্তু ন্দ্বব্ধস্প ভ্রনস্তুন্দ্ব স্তুন্দ্ধব্দব্ধব্ধনস্পু ত্রপ্পস্পন্দ্বব্দব্ধ ব্ধড়ন্দ্বপ্প. ঢ ত্ত্বজন্তুড় ১৭৮০, স্প ন্দ্রন্দ্বভ্রন্দ্বজ ব্ধড্ডু ন্দ্রনন্দ্রব্ধন্দ্বন্দ্ধ ব্ধড়স্পত্তব্ধস্তুব্দ 'ব্দব্ধত্ত্ব্ভ্র ড়স্পত্তব্দন্দ্বব্দ' ভ্রন্দ্বজন্দ্ব ব্ধড়ত্তব্দ স্তুন্দ্বব্দব্ধজস্পস্তুন্দ্বস্তুত্রস্তুত্র ড়ত্তস্তুজন্দ্বস্তুত্রস্তু ন্তুন্দ্বব্ধন্দ্বন্দ্ধ স্মান্দ্বজব্দস্পুব্দ স্মান্দ্বজনব্দড়ন্দ্বস্তু ন্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্তুস্পন্দ্রপ্তব্ধজ্জব্ধনস্প*. ছপ্তস্পস্তু স্পপ্তস্তু ডদ্রব্ভব্দ স্পন্দ্র গ্নস্পড় ট্রস্পপ্পস্ফ্রস্তুঙ্গ .ড্র. ট্রজন্দ্বম্ভ, দ্দস্পপ্ত-১, ২স্তু ড্রস্তু. ছন্ম-৬২গ্ন । সেই অগ্নিকাণ্ডে /স্বন্দ্বপ্রন্তুন্দ্বস্মাব্ধন্দ্ধ ব্ধড্ডব্ধ স্ম্রজব্ধ ভ্রড়নন্তুড় নব্দ ন্তুড্রস্তুব্ধব্ধন্দ্বস্তু স্তু ব্ধড়ন্দ্ব ড্রত্তজস্পস্মান্দ্রুব্দত্রস্তু ব্ধড়ন্দ্ব প্পস্পব্দব্ধ ব্দত্তব্দব্ধব্ধব্দন্ত্রপ্ত স্ম্রজব্ধ স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্বত্রব্ধনল্লন্দ্ব ন্তুড্রত্তব্ধব্ধব্ধব্দ ভ্রব্দ স্তুন্দ্বব্দব্ধজস্পস্তুন্দ্বস্তুস্থ* ।

এ বছর এপ্রিল মাসে এমনই আর একটি অগ্নিকাণ্ডেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়। অগ্নিকাণ্ড রোধের জন্য তখন নগরীর কেন্দ্র থেকে এইসব বস্তি উচ্ছেদের চেষ্টা করা হলেও তাতে সফল হননি কর্তারা। ফলে সিদ্ধান্ত হল যে শহরের মধ্যে বাঁশ ও খড়ের বদলে মাটি ও টালী দিয়ে ঘর বানাতে হবে। যে পরিকল্পনাও বিফল হল।

আরও একটি বড় অগ্নিকাণ্ডের খবর পাই সমাচার দর্পণের ৮ই জানুয়ারী ১৮২০ সালের সংবাদে। ৬ই জানুয়ারী শ্যামবাজারে আগুন লেগে প্রায় দুই প্রহর ধরে অনেক লোকের এবং অনেক সম্পত্তির ক্ষতি হয়। ২২শে জানুয়ারী আবার আগুন লেগেছিল জোড়াসাঁকোর কাশীনাথ বাবুর বাজারে, তাতেও অনেকগুলি বাড়ি পুড়েছিল । কিন্তু সে বছর ৩ এপ্রিল মেহেন্দ্রিবাগানে যে আগুন লাগে তারধবংসের কথা ভাষায় প্রকাশিতব্য নয়। ঐ এলাকায় শুধু কাঁচা বাড়ি নয়, অন্তত দুক্রোশ এলাকা জুড়ে অনেকগুল পাকা বাড়িও ধবংস হয়ে যায়। সংবাদদাতা লিখছেন, "ইহাতে লোকেরদের কত ক্ষতি ও দুঃখ হইল তাহা লিখিয়া কত জানাইব।" ১৫ই মার্চ ১৮১২ সালের বহুবাজারের চুনা গলিতে এক ফকিরের বাড়িতে আগুন লেগে ৮ ঘন্টা ধরে কলুটোলা, টেরিটি বাজার ও বৌবাজার এলাকার প্রচুর বাড়ি ধবংস হয়েছিল। মৌলালির দরগার কাছে নবাববাজারে আগুন লেগেছিল ৭ই এপ্রিল তারিখে। এক দরজির বাড়িতে প্রথমে আগুন লেগে আধা ঘন্টার মধ্যে বেনেপুকুর এলাকার তিন চারশো বাড়ি পুড়ে গেলেও কোন লোকের ক্ষতি হয়নি। লালবাজারের কাছে এক মন্দিরের সামনের পর্দায় ধুনচির আগুন লেগে আশেপাশের অনেক খড়ের ঘর ভস্মীভূত হয়ে মিস্টার ডিকস্টা সাহেবের মদের গুদামে আগুন ছড়িয়ে গেলে তার ৫০,০০০ হাজার টাকার বেশী দামের মদ পুড়ে গেল সেই দুর্ভাগ্যের বছরে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টিতে জল জমলে শহরে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় বস্তিবাসীরাই। বস্তিজীবনের আর একটি বড় সমস্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এমনিতে বস্তিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব, বিপদ - আপদে অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা উচ্চবিত্ত সমাজের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আগুনের মতোই এখানে খবর আর গুজব দুটোই তীব্র বেগে ছড়িয়ে পড়ে, জনতার জমায়েত হতে সময় লাগে না মোটেই, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আরও শীঘ্র। মনের মধ্যে সব 'সময়ই থাকে অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা, দারিদ্র্যের গ্লানি, অক্ষমের ঈর্ষা, বৈভবের পাশে অভাববোধের ধূমায়িত অব্যক্ত ক্রোধ। এর থেকে জন্ম নেয় প্রতিহিংসাপরায়ণতা। কখনো দাঙ্গার আকারে তার প্রকাশ ঘটে।

কলিকাতায় প্রথম থেকেই বস্তিতে হিন্দুদের পাশাপাশি যে মুসলমানরাও বসবাস করছিল, এবং তারা যে সময়সুযোগ মতো হিন্দুদের সঙ্গে টক্কর দেবার সাহসও রাখত, তা বোঝা গেল ১৯৭৮ সালে মহরম ও দুর্গাপূজার উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবার ফলে। ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসের যে পরিচয় পরবর্তী কালের সেনসাস রিপোর্টে পাওয়া যায়, তা হল ---

ধর্ম	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
হিন্দু	৫,৫১,৪৬২	৬,০৪,৮৪১	৯,৪০,৮৪১	৮,৭১,৯৫৬
মুসলমান	২,৪৯,৯৩২	২,৪১,৫৮৭	৩,২৫,০৯৩	৩,২৩,৬৩৩
খ্রীষ্টান	৩৭,৯২৫	৩৯,৫৫১	৪৩,৫৬৩	৪৮,৪৭৩

এছাড়া বেশ কয়েক হাজার শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী ও ইহুদী কলিকাতায় বসবাস করতেন।

(তথ্য Calcutta in 20th Century, P-II)

সে বছর দুর্গাভাসানের কালে রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা বৈঠকখানা বাজারের কাছে পৌঁছতেই একদল মুসলমান সেই প্রতিমা ভেঙে ফেলে বিসর্জনযাত্রী হিন্দু মহিলাদেরও আক্রমণ করে বসল। কিন্তু পরদিন এলাকার ক্রুদ্ধ হিন্দুরা জোট বেঁধে মুসলমানদের কয়েকটি দরগা ভেঙ্গে দিলে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা মুসলমানরা বৌবাজারের সুখময় ঠাকুরের বাড়ি আক্রমণ করে যথেচ্ছ লুটপাট চালিয়ে তার উঠানে দুটি গরু জবাই করে ফেলে রেখে গেল। পরে মেছুয়াবাজারের কানাই বৈরাগীর বাড়িতে ঢুকে সেখানেও লুটপাট করে এই দলটি। হুজ্জুতে মহরমের দাঙ্গায় এর আগে ১৭৭৯ সালে সুপ্রীমকোর্টের আদালতঘরও আক্রান্ত হয়। সে ঘটনা হিরিক স্মৃতিকথায় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।

এমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি ১৮২০ সালে ২৮শে অক্টোবর তারিখের সমাচার দর্পণে। দুর্গোৎসবের সময় হিন্দুরা যখন সপ্তমী পূজার দিনে নবপত্রিকাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে চাঁদনি চকের কাছাকাছি পৌঁছিল, তখন "অনেক মুসলমান সে স্থানে একত্র হইয়া তাহাদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহাদিগের মারপীট করিল এবং ঢোল প্রভৃতি সকল ভাঙ্গিয়া ও নবপত্রিকার কলার গাছ কাটিল তখন হিন্দু লোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া যত - মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিশ চালান করিল।" গায়ের জোরে হুজ্জুতি ও লোকের জিনিষ ছিনতাই করতে এইসব মুসলমানরা কম যেত না। গোরা সাহেবরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি (১৮২০ সালের ২৯ শে অক্টোবর তারিখের সমাচার দর্পণে।)

এরকম দাঙ্গা মাঝে মাঝে চলতে থাকলেও ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা সরকারী চক্রান্তে ভয়াবহ রূপ পায়। বহু দোকনপাট লুঠ হল, হিন্দু রমণীদের ছিনিয়ে নিল দুষ্কৃতী মুসলমানেরা, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল ঘরবাড়িতে। হিন্দুরাও প্রতিরোধ করল পাল্টা আঘাতে। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার খবর অনুসারে ১৮ই আগস্ট তারিখেই মারা গেল ২৭০ জন, আহত ১,৬০০ জন, অগ্নিদগ্ধ হল ৯০০ এরও বেশী বাড়ি। তার আগেই দুইটি ভয়াবহ দাঙ্গা ১৯০৫ এবং ১৯২৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হল।

কলকাতাবাসী চীনারাও হুজজুতি কম করেনি। পুরানো খবর থেকে দেখা যাচ্ছে ক্যানটন থেকে আসা প্রথম দলের চীনাদের সাথে পরে ম্যাকাও থেকে আসা চীনাদের মধ্যে গোলমাল লেগেই থাকত। (৪/৭/১৮১৮, সমাচার দর্পন) কয়েকজন পোর্তুগীজ নাবিকের সাথে মারামারি করে নেটিভ হসপিটলের মধ্যে আর একজন চীনার মৃত্যুর খবর পাই ১৭ই ওক্টোবর, ১৮১৮ সালের পত্রিকায়।

।। শহরে বস্তি চাই ।।

দীনদরিদ্র পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলেই সস্তায় আরাম আয়েশের অনিঃশেষ প্রবাহ বহমান থাকে বলে নগরীর বিলাসবহুল এলাকাকে ঘিরে থাকে ঘিনঘিনে জঘন্য বস্তি। সেকালের ক্যামাক স্ট্রিটের বামুন বস্তিই হোক, আর একালের বালিগঞ্জের রেললাইনের ধারেই বস্তিই হোক, সকালে বিবিদের বাসনমাজা ঘরমোছার এমন সস্তা সেবা কে দিতে পারবে?

কথা হল, বস্তি ছাড়া কি কলিকাতা টিকবে? বস্তি তুলে দেওয়ার সময় কি এসেছে? তা এখনই তো নয়ই। যে লক্ষ লক্ষ সস্তার শ্রমিক চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে, আয় আর সম্পদ বন্টনের ব্যবধান যেখানে প্রকট, সেখানে সাংসারিক কাজে মানুষে বিকল্প যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে মানুষ কি নিজের আরামআয়েশ বিসর্জন দিতে তৈরী হবে এখনই? স্পষ্ট করেই বলা যায়, না। এখানে ইউরোপ বা আমেরিকার উদাহরণ মোটেই চলবে না। শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের গৌরব মার্কস্‌বাদী এই রাজ্যে শুধু কথার কথা। তাই সল্টলেকে যে বস্তিবাসীর হার শতকরা ২৯.৩ শতাংশ, তেমনি নিউটাউন - রাজার হাটেও এক লক্ষ লোকের বসতির পাশে সস্তার গৃহভৃত্যের জোগান দিতে বস্তির প্রয়োজন দেখা দেবে। তার জন্য আগাম ব্যবস্থা না রাখলে এই ধরনের লোকেরা সরকারী জায়গা দখল করে সল্টলেকের সুকান্ত নগর, দত্তাবাদের মতো কলোনী স্থাপন করবে বিনা পয়সায়। সে জন্য নিউটাউনে ৭,০০০ আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে /ত্রন্দ্বজ্ঞন্ন্তন্দ্ব দ্দন্গুপ্তন্ধন্দ্ব* হিসেবে; আমাদের সুবিবেচক মন্ত্রী মশাই বলেন, এর ফলে সল্টলেকের মতো ভৃত্যসমস্যা থাকবে না নিউ টাউনে। সত্য চেপে না গেলে আসল কথা হল, সল্টলেকেও ভৃত্য সমস্যা নেই, আছে তাদের না থাকার অব্যবস্থা।

।। গৃহভৃত্য ।।

বস্তি ছেড়ে এবার শহরের অন্যান্য বাসিন্দাদের দিকেও দৃষ্টি ফেরানো যাক।

দেখা যাচ্ছে যে এই ঊনিশ শতকের প্রথম দিকেই কলিকাতার গ্রামচরিত্র বদলে গিয়ে সড়ক মহাসড়ক নির্মিত হতে গাড়ীঘোড়া ক্রমশ বেড়ে গিয়ে আধুনিক পের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। এক দিকে যেমন আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা গড়ে উঠতে লাগল, তেমনিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলল নতুন নতুন বস্তির পত্তন, সেই অট্টালিকাবাসীদের পরিষেবা যোগাতে। নতুন শহর গড়ার প্রতিক্রিয়ায় এতদঅঞ্চলের পুরানো বাসিন্দারা ক্রমশ উৎখাত হয়ে জীবিকা বদলে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল নিশ্চয়ই; এখন যেমন রাজারহাট টাউনশিপ গড়ে তুলতে চাষী আর মাছের ভেড়ীর মালিকদের বংশধরেরা ইট বালি সাপ্লাই বা এস. টি. ডি. বুথ খুলে নতুনভাবে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করছে। ছুতোর, রাজমিস্ত্রি কামার, কুমোরদের সাথে কুলিমজুর গৃহকর্মের নানাশ্রেণীর ভৃত্য, বেয়ারা, গাড়োয়ান, কারিগর, নাপিত, ধোবারা নগত পয়সা কামানোর জন্য গ্রাম থেকে শহরে এসে আস্তানা গাড়ল। এভাবে ধনীর সেবার জন্য নতুন একটি দরিদ্র শ্রেণী গড়ে উঠল।

একদিকে দুর্ভিক্ষ, জমিদারের খাজনা আদায়কারীদের অত্যাচার এবং অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধের পরে ভারতে খানদানী মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে তাদের নফর, চাকর, খানসামারাও বিলিতি সাহেবদের সেবার মাধ্যমে বিকল্প জীবিকার সন্ধান পেতে শহরে এসে পড়ল। অনুমান করা যেতে পারে যে খাদ্যাখাদ্য বিচারে খ্রীস্টান সাহেবদের রসুইঘরে হিন্দু পাচক - মহারাজরা সহজে ঢুকতেচায়নি বলে আমীর উজির নাজিরদের নোকর চাকরেরা বাবুর্চি আর খানসামার পদগুলি সহজেই দখল করে নিতে পেরেছিল পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই।

সস্তায় অফুরন্ত যোগান ছিল বলে বিলিতী ফোতো নবাবেরা এদেশে এসে বিশ - পঞ্চাশ - একশো - দেড়শো নকর - চাকর নিয়ে প্রসাদ সাজিয়ে বসেছিলেন। এক একটি পরিবারে ২৫/৩০ জন তো বটেই, যাদের আর্থিক সঙ্গতি দৃঢ় ছিল, তাদের পরিবারে ১০০/১৫০ পর্যন্ত সেবক ভৃত্য ছিল। (দ্র. উৎসাহী পাঠক লেখকের 'নগর কলিকাতার নফরতন্ত্র' পড়ে দেখতে পারেন)। ১৭৫৯ সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে একজন খানসামা বেতন পেত ৫ টাকা, প্রধান পাচক ৫ টাকা, কোচোয়ান ৫ টাকা, জমাদার ৪ টাকা, খিদমৎগার৩ টাকা, সর্দার বেয়ারা ৩ টাকা, বেয়ারা আড়াই টাকা, হরকরা আড়াই টাকা, ধোপা ৩ টাকা, সহিস ২ টাকা মশালচি ২ টাকা, পরামাণিক ১ টাকা, হেয়ার ড্রেসার দেড় টাকা। কিন্তু তারা সবাই এই বেতনে সন্তুষ্ট ছিল না। সম্ভবত তার একটা বড় কারণ হল, সমাজের নানা পেশা থেকে এরা এসেছিল বলে ভৃত্যের জন্মগত তক্‌মা তাদের গায়ে সেঁটে বসেনি। বিকল্প আয়ের পথ তখনো খোলা ছিল বলে একবার তারা অন্যায় অত্যাচার ও জুলুমের প্রতিবাদ করে বেতন বৃদ্ধির দাবী করে বসল।

এ দেশের নতুন জমিদারদের পক্ষে এই দাবী বেশ জলুশ বলেই মনে হল। কোনরকম রাজনৈতিক সমর্থন বা সংগঠনের আওতায় না থেকে যে আন্দোলন তারা করেছিল তাতে বাধ্য হয়ে ১৭৫৯ সালের ২১ শে মে কলিকাতার ইংরেজ জমিদার তার সভাসদদের নিয়ে উপায় খুঁজতে মিটিং ডেকেছিলেন। J. Z. Holwell, Richard Becher, W. Frankland - এর মতো গণ্যমান্য লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার গুত্ব থেকে কলিকাতার সম্পন্ন লোকেরাই যে জমিদারের কাছে নালিশটি করেছিলেন, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

গতরে খাটতে পারে এমন লোকদের কাছে তখনও হাজারো কাজের পথ খোলা পড়ে ছিল। কেউ সিপাহীর কাছে যোগ দিতে পারছে তো কেউ কেল্লা নির্মাণের কাজে। রাস্তাঘাট তৈরী, বাড়িঘর নির্মাণ, গাড়ীর চালক, মুটে মজুরের কাজের সুযোগ যাদের সামনে খোলা, তারা কম বেতনে অন্যের সেবা করতে এসে স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে কেন? এই শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা যে সৌন্যদলে যোগ দেওয়া বা শ্রমিক - মজুরের কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে বলেই তাদের উচ্চবেতন দাবী করার মতো এই ঔদ্ধত্য জন্মেছে বলেও সভায় গৃহীত প্রস্তাবে মন্তব্য করা হল। কিন্তু নিয়ম মতো এই প্রস্তাবের শুতেই তাঁরা এই সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করলেন---

Taking into consideration the united complaints of the inhabitants with respect not only to the insolence but exorbitant wages extracted by the menial servants of the settlement for sometime past, and having duly weighted and considered the premises, we are of opinion that their complaints are to justify founded and loudly call for redress… the root of these evils lie in our servants being admitted into the body of sepoys, or received on the works of the new fortifications… "[Rev. J. Long / Selections from unpublished Records etc. / Calcutta, 1869].

এই সাহেবরা কিছুটা আত্মরক্ষার তাগিদেই যেন এই অধিবেশনে আলাপ আলোচনা করে মন্তব্য করলেন "কলিকাতাবাসী ইংরাজদের ভৃত্যবর্গ উদ্ধত হইয়াছে -- অতিরিক্ত হারে বেতনের দাবী করিতেছে।" এই আলোচনায় কেবল চাকরদের বেতনই বেঁধে দেওয়া হল না, তাদের একটি আচরণবিধিও তৈরী করা হল। সম্ভবত এটিই ভারতে ইংরেজ প্রণীত প্রথম Conduct Rules. এই নির্ধারিত বেতনে কেউ চাকুরী করতে না চাইলে তার বিচার হবে; বিচারে তার জরিমানা, বাসোচ্ছেদ, কারাদণ্ড সহ দৈহিক সাজাও হতে পারে। কর্মত্যাগের আগে একমাসের নোটিস দিতে হবে, মনিবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, প্রভৃতি অপরাধের জন্যও তাদের বিচার হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর চাকরদের তখন ৫ টাকা থেকে সর্বনিম্ন একটাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন স্থির হল। (কলিকাতা / সেকালের ও একালের)।

এই জমিদারসভা যে সিদ্ধান্তই দিক না কেন, ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ফলে ভৃত্যদের বেতন পরবর্তী ১৫/১৬ বছরে দ্বিগুণ থেকে পাঁচগুণ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল তা W. H. Carey-এর The Good Old Days of Honourable John Company থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ১৭৮৫ সালেই এইসব ভৃত্যদের বেতন বেড়ে গিয়েছিল অনেকটা। যেমন খানসামার বেতন ৫ টাকা থেকে বেড়ে ১০/১৫ টকা, প্রধান পাচকের বেতন ১৫/৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছিল। অনুরূপ বেতন কাঠানো বাকী সব ধরনের ভৃত্যদের মধ্যেও বেড়েছিল। কিন্তু ধোবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধিটা চোখে পড়ার মতো। তাদের পূর্ব বেতন ৩ টাকা থেকে বেড়ে ১৫/২০ টকায় দাঁড়িয়েছিল। ১৯০১ সালে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের স্থাপনের আগে প্রাত্যহিক কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার শু হয়নি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নিতে শু করল বিশের দশক থেকে। ততদিন ধরে পাঙ্খাপুলারদের কাজটি টিকে ছিল এদেশে। আবার বিলাতী সাহেবদের মতো নানা ধরনের হেয়ার ড্রেসারের আনাগোনা বা মাইনে করা হেয়ারৈ ড্রেসার তো নেটিভদের বাড়ীতে ছিল না। সেকালেনাপিতদের মাসে আট আনা একটা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করা হত। তারা বাড়ির সবার দাড়ি কামানো, চুল ছাঁটার কাজ করে দিত। (কলকাতা অতুল সুর পৃ. ২৫৫)

পরর্তী কালে যে গৃহভৃত্যের যোগান দেওয়াট একটা ব্যবসায়ে পরিনত হয়ে যাবে, বিগত দুই শতাব্দী আগেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৭৯৪ সালে কলিকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হল, ইংরেজিতে কথাবার্তা জানা "কোনো ইউরোপীয়নের কন্যা, অথচ এদেশী স্ত্রীলোক হলেই ভাল হয়" এমন পরিচারিকা চাই। ইউরোপীয়ানদের ঔরসজাত এদেশীয় রমণীর গর্ভে জাত একটি প্রজন্ম সমাজে স্থান দখল করে নেওয়ায় সমাজবিন্যাসের এই বিশেষ ধরনটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন থেকেই। ৫ই এপ্রিল ১৮৮০ - তে একটি বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে---

Servants Registry Office: 11, British India Street.
Servants of all descriptions can be obtained at the above office. DA Cox & Co.
(The Statesman পত্রিকার বিজ্ঞাপন)।

জানুয়ারী ১৯০০ সনের অন্য একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে যে গৃহভৃত্য সরবরাহের জন্য লোকেরা এজেন্সি খুলে বসে গেছে; হরেকরকম, হরেক জাতির ভৃত্যের জোগান তারা দিতে সক্ষম। সেই বিজ্ঞাপনেও প্রায় একই রকম ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল---

January 1900
Wanted – Orders for most reliable servants of
all caste and creeds. "Madrasee Servants" a
speciality – Apply to P. Rezenbe & Co.
1.্ন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বব্দপ্তন্দ্বন্তত্রব্ধব্জন্দ্বন্দ্বব্ধ. Calcutta."

সম্ভবত মাদ্রাজী ভৃত্যদের একটা বিশেষ গুত্ব ছিল বলে তাদের কথা ইন্‌ভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়েছে। (কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত / বিনয় ঘোষ / ২য় খণ্ড)।

এই সব চাকরেরা যে শুধু সেবাধর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিল, তা তো নয়। সুযোগসুবিধা পেলে তাঁরা সাহেবদের উচ্ছিষ্ট মধুও দু'চার ফোঁটা খেয়ে নিত। একটু আড়ালে আবডালে সাহেবের খাদ্যপানীয়ে যেমন ভাগ বসিয়ে দিত, তেমনি তাদের নারীদের সাহচর্যও একটু করে নিত। অ্যাটর্নী হিকি তো স্পষ্টই লিখেছেন, স্ত্রীবিয়োগের পরে তিনি যখন কিরণবালা নামের এদেশীয় এক রমণীর সাথে চিত্তের বিরহজ্বালা নির্বাপণন করছিলেন, তখন তাদের একটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ পুত্র জন্মাল। ছেলেটির পিতৃসূত্র অনুসন্ধানে একদিন অসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পেলেন যে তাঁর কিরণবালা তার একজন এদেশীয় খিতমৎগারের আলিঙ্গনে শায়িতা। সাহেবের দুধে চুমুক দিয়ে জল দিয়ে তা পূরণ করা, বাজারে গিয়ে কিছু নগদ মেরে দেওয়া, ঘর থেকে টাকা ঘড়ি বোতাম তুলে নেওয়া, সুযোগ মতো সাহেবের সেলারের বোতল খালি করা বেশ নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এইসব ছোটখাট স্বীকৃত পদ্ধতি বলে গ্রাহ্য হয়েছিল। ১৮২৩ সালে ফ্যানি পার্কস এই চালপড়ার (Trial by Rice) বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

।। গোলামীর পর্ব ।।

নফর চাকর বাহিনী ছাড়াও ছিল ক্রীতদাস বা গোলাম। তারা যেমন এদেশে নানা অঞ্চল থেকে আসত তেমনি আফ্রিকা ও মালয় থেকেও জাহাজ যোগে আনীত হত। অষ্টাদশ শতকের পত্রপত্রিকার বিবরণ অনুসারে এদেশের অনেক ইংরেজ; এমন কি, চন্দনগরের ফরাসী পরিবারেও কাফ্রী ক্রীতদাস দেখা যেত। এর পিছনে হয়তো তাদের মাথায় একটি বাস্তববুদ্ধি কাজ করত। ক্রীতদাসদের উপর যে অমানবিক অত্যাচার করা হতো, তা এদেশের লোকের উপর করলে বিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলেই হয়তো ভারতবর্ষের ইংরেজরা এখানে বসে আফ্রিকার ক্রীতদাসই বেশী পছন্দ করতো। আর এদেশের দাসদের চালান করতো ইউরোপে কিংবা

অন্যত্র কোথাও। সেকালে ক্যালকাটা গেজেটে গোলাম কোনাবেচো বা পলাতক গোলামের সন্ধান দেবার অনুরোধ জানিয়ে অনেক বিজ্ঞাপনই ছাপানো হয়েছিল। এখন যেমন ভাল জাতের কুকুরের বাচ্চা কেনাবেচো হয়। যেমন --- /ক্লব্ধন্দ্বস্তুত্র ট্রস্পন্দ্রন্দ্রজন্দ্বন্দ্ব বদপ্পন্দ্ব ত্তুক্রস্ত ম্মান্দ্বজবদস্ফ স্তন্দ্ববদনজস্পত্তব্দ স্পন্দ্র স্তনবদম্মাস্পবদন্দ্ধস্পন্দ্র বদত্তন্তড়ত্র স্তাস্তক্রস্ত ন্তু ভ্রজক্লব্ধ ড়নপ্প ন্দ্রনব্ধড়ন্দ্রত্তপ্তক্রস্ত ড়স্পন্দ্ববদব্ধ বন্দ্বজ্ঞক্লব্ধ ভ্রনপ্তপ্ত ম্মাপ্তন্দ্ববদন্দ্ব ব্ধস্পত্রম্মাম্মাপ্তভব্ধস্প ব্ধড়ন্দ্ব ম্মাজন্দ্ধন্দ্বজ*

কিংবা /বস্প ন্ধ্ব বদস্পপ্তস্ত —ট ন্দ্রন্দন্দ্ব ট্রস্পন্দ্রন্দ্রজন্দ্বন্দ্ব স্তাভ ব্ধড়ুব্ধ ত্তস্তন্দ্বজবদক্রস্তত্তব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ত্তুবদন্দন্দ্ববদব্দ স্পন্দ্রত্র ত্তুব্ধপ্তন্দ্বজ, স্পনব্ধপ্পত্তব্ধন্ধজ,ক্রস্ত ন্তস্পস্পস্পন্দন্দ্ধ Price four humdred Sicca Rupees. ট্রন্ত গুন্দ্বব্ধপ্তন্দ্বপ্পন্দ্ব ভ্রক্লব্ধন্দন্দ্ধ বদত্তন্তড়ত্র বন্দ্বজ্ঞক্লব্ধ, স্থ্রাভ বদন্দ্বন্দ্ব ড়নপ্প,ক্রস্ত ন্ধ্ব ন্দন্দ্রস্পজপ্পন্দ্বস্ত স্পন্দ্র ন্দ্রত্তজব্ধড়ন্দ্বজ ম্মন্ত্রজব্ধনন্তত্তপ্তজবদ ত্তুম্মাম্মাপ্তন্তন্দ্ধব্ধস্প ব্ধড়ন্দ্ব ম্মাজন্দ্ধন্দ্বজ.*

কিংবা নিদ্দিষ্টের সন্ধানে /ত্রপ্পন্দ্ব স্তাভব্দ জত্তত্রভ্রন্ত- স্ফ ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রনন্দ্রব্ধন্দ্বন্দ্ব স্পন্দ্র খন্তত্তব্ধস্পন্দ্ধজ প্তবদব্ধ ব্ধভ্রস্প বদপ্পন্দ্ব স্তাভব্দ, স্থত্রপ্পন্দ্বস্ত ত্রপ্পক্রস্ত বস্পপ্প,ক্রস্তাত্তব্ধ ন্দ্বপ্তন্দ্বন্দ্ব ভদ্বজবদ স্পন্দ্রত্রব্ধন্দ্ব,ক্রস্ত ন্দ্বপ্পন্তব্ধপ্তভ স্পন্দ্রত্র বদনভ্রন্দ্ব, জ্ঞত্রভ্রন্ত, ভ্রনব্ধড়ত্র ষ্কজন্দ্ববদ শুক্লব্ধনব্ধভ স্পন্দ্র ম্মাপ্তব্ধন্দ্ববদ ন্দ্বব্ধন্ত. ন্দ্বব্ধন্ত. বড়নব্দ নব্দ ব্ধস্প জন্দ্বশুত্তন্দ্ববদব্ধ, নন্দ্র ব্ধড়ন্দ্বভ স্পন্দ্রন্দ্রন্দ্বজ ব্ধড়ন্দ্বনজ বন্দ্বজ্ঞনন্তন্দ্ব ব্ধস্পক্রভ গুন্দ্বব্ধপ্তন্দ্বস্প, ব্ধড়ন্দ্বভ ভ্রনপ্তপ্ত ন্ধ্ব বদস্প স্পনন্তত্রব্দ ব্ধস্প ন্দ্বপ্পপ্পন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্বনজত্রজপ্পব্দ, স্পন্দ্ববদম্ম ব্ধড়ন্দ্বপ্প ন্তস্পন্দ্রন্দন্দ্বস্তক্রস্ত ন্দন্দ্রস্পজপ্প ব্ধড়ন্দ্ব স্পভ্রন্দ্বজ. ট জন্দ্বভ্রজস্ত স্পন্দ্র স্পন্দ্ব ড়ত্তস্তজন্দ্বস্ত বদনন্তন্ত জত্তম্মান্দ্ববদব্দ ভ্রনপ্তপ্ত ন্ধ্ব ষ্কন্দ্ব ব্ধস্পক্রভ স্তুন্তস্প স্প, ব্ধস্প ত্রম্মাম্মাজন্দ্বড়ন্দ্বস্তক্রস্ত স্তন্দ্বপ্তন্দ্বজ ব্ধড়ন্দ্বপ্প ত্তম্মা*

এই শ্যাম ও টমের গতি বা দুর্গতি কি হয়েছিল, সমকালীন তথ্য থেকে তা জানার কোন উপায় না থাকলেও অত্যাচারের ভয়ে যে তারা পালিয়ে গিয়েছিল, নিশ্চিত করে বলা যায়। এই অজানা অচেনা বিশেষ বিভূঁয়ে তা থেকে তাদের পালিয়ে বাঁচবার কোন পথ ছিল না। যারা নিজেদের সভ্য বলে দাবী করে অন্য মানুষের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, শ্যাম টমদের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাদের হাত থেকে নিস্তার ছিল না। দুই একজন টম হয়তো পালিয়ে গিয়ে জনবিরল কোন স্থানে গিয়ে কিছুদিন বাঁচতেপেরেছিল। তারপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল, বরং বলা ভাল, সেই অত্যাচারেই তাদের মৃত্যুর কোলে মুক্তিমিলেছিল।

এদেশেও লোকেরা দাণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিজেদের স্ত্রী পুত্রদের বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল, এমন তথ্যও বিরল নয়। ১৮২৫-এর ১৮ জুন 'সমাচার দর্পন' পত্রিক ায় রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধ উপক্ষ্যে দানের দানসামগ্রী বানাতে নিজের দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যাকে বর্ধমান থেকে কলিকাতায় নিয়ে আসছিল এক বৈষ্ণবী। কিন্তু ফরাসডাঙ্গা পর্যন্ত আসতে না আসতেই শ্রাদ্ধের দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় ঐ কন্যাকে রাজা কিষণচাঁদ রায়বাহাদুরের কাছে ১৫০ টাকায় বিক্রি করে দেশে ফিরে গেল সেই বৈষ্ণবী। ১১ অক্টোবর ১৮২৫ এ পত্রিকার অন্য এক সংবাদে পাওয়া যায়, বর্ধমানের জনৈক কলু অভাবের তাড়নায় তার বিশবর্ষীয়া স্ত্রীকে কয়েকটি টাকার বিনিময়ে এক যুবাপুষের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। কলিকাতার একজন জমিদার কাশী থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ভাগলপুরের হাট থেকে ৪০ টাক ায় একজন লোককে কিনে নিয়ে এসে জানালেন যে ঐ হাটে আরও ২০/২৫ জন দাসদাসী ঐ দিন বিক্রিবাটা হয়েছিল। এখবর ১৮৪০-এর ১১ জানুয়ারীর। কিন্তু এর আগেই রানীর সাম্রাজ্যে দাস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল ১৮৩৩ সালে। আরভারতবর্ষে তা বন্ধ হয় দশ বছর পরে ১৯৪৩ সালের পঞ্চম আইনের দ্বারা।

এদেশে জনতার দারিদ্র্যই যে দাসপ্রথাকে বাড়বাড়ন্ত করেছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেই সঙ্গে ইউরোপীয়দের বণিকবৃত্তি অসহায় মানুষকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে গেল। ১৭৬৩-এর ৩০ ডিসেম্বরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা পশ্চিম উপকূলে তাদের উপনিবেশ থেকে দাস চালান করার নানা ফন্দিফিকির ব্যাখ্যা করে দুই জাহাজভর্তি কিশোর এবং যুবক শ্রেণীর দাস ফোর্টমার্লবরোতে চালান করার সংবাদ জানান। লাভজনক দামের কথা মাথায় রেখে ঠিক করা হল, দাসদের মধ্যে পুষদের বয়স ২৫ থেকে৪০ হলেও মেয়েরা ২৫ বছরের বেশী বয়স্কা হবে না। শিশুদের মধ্যে দশ বছরের বালক বালিকারা থাকবে। দ াস পিছু জাহাজের মালিকপাবে ১৫ পাউন্ড(সূত্র Court's letter to Bengal, February22, 1764).

কোম্পানীর এই অমানবিক কর্মে যে শাসকদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল সে তথ্যও প্রচুর পাওয়া যায়। আইনী কৌশলে ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশের লোকদের বিনামূল্যে দ াসে পরিণত করার একটা ফন্দি বের করেছিলেন। ডাকাতদের - ফাঁসির সাজা দিয়ে তাদের পরিবারেরলোকদের গভর্নমেন্টের গোলামে পরিণত করার আইন করেছিলেন তিনি। /বড়ন্দ্ব ষ্ঠপ্পনপ্তভস্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্তজনপ্পন্ত্রপ্তব্দ বদড়ুপ্তপ্ত ন্ধ্বন্তস্পপ্পন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব বদপ্পন্দ্ব স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ত্রব্ধব্ধন্দ্ব,ক্রস্ত বদড়ুপ্তপ্ত ন্ধ্ব স্তনবদম্মাস্পবদন্দ্বস্ত স্পন্দ্র ন্দ্রস্পজ ব্ধড়ন্দ্ব ষ্কন্দ্বজ্রপ্ত ন্তস্পন্দ্বনন্দ্বন্তন্দ্বক্রস্ত ন্ধ্বন্দ্বন্দ্রনব্ধ স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ম্মান্দ্বস্পম্মাপ্তন্দ্বত্রন্তন্তস্পজস্তন্দন্দ্ধব্ধস্প ব্ধড়ন্দ্ব স্তনজন্দ্বন্তব্ধনস্ফ স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব গুস্পন্দ্বজস্পন্দ্বব্ধ* এরা ছাড়াও দণ্ডিত আসামীদের অহেতুক জেলে রেখে পয়সা নষ্ট করে খাবার জোগানের চেয়ে তাদের কোম্পানীর অন্যান্য উপনিবেশে পাঠিয়ে দিলে যেমন বিনামূল্যে service পাওয়া যাবে, সরকারী খরচও তেমনি বেঁচে যাবে। এভাবে একদেশের দুঃস্থ মানুষেরা সেই অন্ধকার যুগে অন্য দেশে গিয়ে ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। কিন্তু তথাকথিত উদার মানবতাপন্থী ব্রিটিশদের কাছে কণার যে ছিটে ফোঁটাও তারা পায়নি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্সের ১৭৫ সালের এক রায়ে সেই মর্মন্তুদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

"…the condition of slaves within our jurisdiction is beyond imagination, deplorable; and that cruelties are daily practiced on them, chiefly on those of the tenderest age and the weaker sex, which, if it would not give me pain to repeat and you to hear, yet for the honour of human nature I should forbear to particularize, if I expect the English from this censure, it is not through partial affection to my own countrymen, but because my information relates chiefly to people of other nations, who likewise call them selves Christians. Hardly a man or a women exists in a corner of this populous town, who hath not at least one slave child either purchased at a trifling price or saved perhaps from a death that might have been fortunate, for a life that seldom fails of being miserable. Many of you, I presume, have seen large boats filled with such children coming down the river for open sale at Calcutta."

কিন্তু সেদিনের কলিকাতার ইংরেজ সমাজের অন্যান্যদের এই লজ্জাবোধটুকুও যে ছিল না, সে কথা এই রায়ে গোপন থাকেনি। খ্রীস্টানসুলভ দয়ামায়ারও কোন স্থ ান ছিল না এই দাসদের প্রতি, বিশেষত শিশু ও স্ত্রীলোকদের প্রতি। এই খ্রীস্টের ভক্তরা আবার দেশে ফেরার পথে দুচারজন কালাআদমীকে সাদাদের দেশে দেখানো ার লোভ দেখিয়ে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যেত, দেশে গিয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে রাহাখরচটা তুলে নেবার উদ্দেশ্যে। এটা বন্ধ করার জন্য কোম্পানীকে ১৭৯৩ সালে একটি ঘোষণাপত্র জারী করতে হল। শুধু ইংরেজ কেন, আজকের শিল্প সংস্কৃতির মক্কা বলে খ্যাত ফরাসীরাও চন্দননগরে একই কেচ্ছা শু করেছিল বলে সেখানে অ াদেশ জারী করতে হয়েছিল যে গভর্নরের আদেশ ব্যতিরেকে কোন জাহাজের ক্যাপ্টেনই এদেশের কোন লোককে জাহাজে তুলবে না।

কলিকাতার বাজারও গোলাম কেনাবেচার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এমন অনেক তথ্য ব্রিটিশরা বেশ রেখে গেছে। কোম্পানীও তখন এই সুযোগে কিছু কামিয়ে নেবার ধান্ধায় ছিল। গোলাম পিছু সোয়া চার টাকা 'ডিউটি' ধার্য করা হয়েছিল কেনাবেচার সময়ে। বাজার কলিকাতার জু ১৭১১ সালের আয় - ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ক্রীতদাস কেনাবেচার খাতে তাদের ১০৩ টাকা এক আনা এক পাই হয়েছিল। (কলিকাতা / সেকালের ও একালের)

সুতরাং ভৃত্যবাহিনী ছাড়াও ইংরেজ পরিবারগুলিতে তখন যে ক্রীতদাসদের রাখা হত, হয়তো তাঁদের আভিজাত্যের কিছুটানির্ভর করতো ক্রীতদাসের সংখ্যার উপর, তা অনুমান করতে কোন সমস্যা হয় না। ক্রীতদাসের সেবা থেকে একটা বাড়তি সুবিধা ছিল।তাদের মাইনে পত্র দেবার ঝঞ্ঝাট ছিল না, ইচ্ছামতো কাজে লাগানো যেতো এবং সীমাহীন অত্যাচারেও তাদের প্রতিবাদ করার জো ছিল না, আর পছন্দ না হলে বিক্রি করে বিনিয়োগ করা টাকা তুলে নেওয়া যেতো লোকসান পুষিয়ে।। এই ক্রীতদাসরা বৃদ্ধ কিংবা অকেজো হয়ে গেলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হতো গৃহে পোষা কুকুর বিড়ালের মতো। আজন্ম অবহেলা আর অনাদরে থাকা সেই বর্জিত মানুষেরা রাস্তার পশুর মতোই একদিন ভবলীলা সাঙ্গ করতো। আবার ক্রীতদাস প্রথার অবসানে যাদের মুক্তি হয়েছিল তাদের সামনেও কোন সুবর্ণসুযোগ এসে উপস্থিত হয়নি। শহরকে আশ্রয় করেও তাদের অন্যের সেবক হয়ে কিংবা অন্য কোন কায়িক পরিশ্রমে দিনগুজরান করতে হয়েছিল। কলিকাতার হতভাগাদের দলে তারাই নবতম সংযোজনরূপে দেখা গেল, ঘিঞ্জি বস্তি আর রাস্তার ধারে বসতি স্থাপন করে নিল।

।। বেহারা গাড়োয়ান ।।

ব্রিটিশদের আগমনের অনেক আগে থেকেই এদেশে পালকির ব্যবহার থাকলেও তারা গ্রামবাংলার ধনী সম্ভ্রান্তদের বয়ে বেড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে। ক্রমে স াহেবদের মধ্যেও পালকির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতে পালকির ব্যবহার প্রসঙ্গে মি. স্যামুয়েল ব্রিগসের পার্লামেন্টরী Evidence এর কথা উল্লেখযে াগ্য --- /[illegible]* (তিন শতকের কলকাতা / পৃ. ৬)।

তারও আগে ভারতে পালকির ব্যবহারের উল্লেখ আছে তুজুক-ই- জাহাঙ্গিরীতে, ''সামাজিক প্রথানুসারে রাজারাজড়াদেরও রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধযাত্রা কালে এরই মধ্যে থেকে (হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, গর গাড়ি) একটি বেছে নিতে হয় দেশেটির ভৌগলিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। রাজ্যটি পূর্বদিকে হলে হাতী, পশ্চিমে হলে একরাঙা অশ্ব, উত্তর দিকে পাল্কী আর দক্ষিণে হলে গর গাড়ী প্রশস্ত''।

শহর কলিকাতায় ওড়িয়া বেহারারা এই কাজে দক্ষতা দেখিয়েছিল। হয়তো বাঙালার তুলনায় অতিমাত্রায় দরিদ্র কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী বলেই নিজেদের দুর্দশা মে াচনের জন্য সুদূর উড়িষ্যা থেকে দয়ামায়াহীন এই নগরে এসে তারা জিটির সন্ধান করেছিল।সমাচার দর্পণের এক খবরে জানা যাচ্ছে ''হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যার ও তাহার কিঞ্চিৎ ও ফিরিয়া আনে না (২৭/২/১৮১৯)।

ক্রমশ তাদের সাথে এদেশীয়রাও যোগ দিল। কিন্তু তাতে তাদের দুর্দশা কতটা ঘুচেছিল তা বলা সম্ভব নয়, কারণ ১৮৪০-৪১ সালের হিসেব থেকে দেখা যায় যে সার াদিনে একটি ঘোড়ার জন্য ভাড়া লাগে পাঁচটাকা আর সেখানে একজন পালকি বেহারার মজুরি মাত্র চারআনা। কিন্তু তার কাজের সময় ১৪ ঘন্টা। আর আধা দিনের জন্য দুই আনা, একঘন্টার কম সময়ের জন্য এক আনা। আরপালকির ভাড়া বেহারাদের ভাড়ার সমপর্যায়ের। অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা নয়, ঘোড়ার গতি ও ক্ষমতাকেই সে কালের অর্থসর্বস্ব মানুষেরাবেশী গুত্ব দিয়ে দেখেছিল। সেই হিসেবে মাসের ত্রিশ দিন কাজ পেলে আয় হতে পারত সাড়ে সাত টাকা কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ না করে যারা ধনীর গৃহে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের অবস্থাও যে খুব বেশী ভাল ছিল তা বলা যায় না।

কলিকাতায় উড়িষ্যা থেকে প্রথম এসেছিল পালকি বেহারা শ্রেণীর লোকেরা। তাদের আগমনেরও কিছু ইতিহাস ছিল অবশ্য। সেকালে পালকি বাহকের কাজ করত দুলে - বাগদি - মাহার শ্রেণীর লোকেরা, উচ্চবর্ণের কাছে যারা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত । ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মহিলারা তাই পালকিতে চড়ে কোথাও গেলে দুলে - বাগদিদের ছোঁয়া লাগায় তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র বদল না করে তাঁরা পূজা আহ্নিক বা আহার করতেন না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য চন্দননগরের দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উড়িষ্যা থেকে গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত বাহকদের নিয়ে আসেন। কলিকাতায় নবকৃষ্ণদেবও সেই একই পথ অনুসরণ করলেন। এ অঞ্চলের বেহার াদের সাথে উড়িষ্যা থেকে গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত বাহকদের নিয়ে আসেন। কলিকাতায় নবকৃষ্ণদেবও সেই একই পথ অনুসরণ করলেন। এ অঞ্চলেরবেহারাদের সাথে উড়িষ্যার বেহারারা মিলে ১৮৩৯ সাল নাগাদ কলিকাতায় ১১,৫০০ জন ঠিকে বেহারার উপস্থিতি জানা যায়। ঠিকে পালকির সংখ্যাও হয়ে গেল ২,৮৭৫ খানা। এরা সবাই ঘন্টা হিসেবে ভাড়া খেটে অন্যের জন্য কাজ করত। এখানকার রিক্সা বা ট্যাক্সির বিকল্প হিসেবেই পালকি চলল অনেক দিন পর্যন্ত। অতুল সুর মহাশয় জ ানাচ্ছেন যে ১৯২৬ সালে তাঁর বিবাহের পরে পালকিযোগেই তিনিশ্বশুর বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

সে সময়ে ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতেন। প্রথম দিকে বিলেত থেকে গাড়ী এলেও পরে এদেশেইসেই গাড়ি নির্মিত হতে লাগল। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে অন্তত দশজন বিলাতী কোচমেকারের নাম জানা যায়। প্রথম দিকে চ্যারিয়ট, পালকি, ব্রাউন বেরী, ছোট পালকি ও বগী গাড়ি ন ামের গাড়ি তৈরী হলেও ক্রমশ ফিটন, ব্রুহাম নামের গাড়িও ধনীদের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠল। ক্রমে সাধারণের চলার জন্য ছ্যাকরা গাড়ি শু হল। গাড়ির ক্লাশ অনুসারে ভাড়া ঠিক হতো। এর ফলেগাড়োয়ান, কোচোয়ান, সহিস, ঘেসেরা, আস্তাবলের কর্মী হিসেবে কাজ করার নতুন পেশার সুযোগ এল। বাঙালীদের মধ্যে নবকৃষ্ণ দেবপ্রথম গাড়ি কিনে সেযুগে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

।। মুটেমজুর ।।

আসলে গ্রামসমাজের জাতপাত কুলগত পেশার বন্ধন শহরে এসে শিথিল হয়ে যাবার পরে যোগ্যতা বুদ্ধি ও কুশলতার দ্বারাকলিকাতায় নবাগতদের অনেকেই ধুলে ামুঠিকে সোনামুঠিকে পরিণত করে ফেললেন অনায়াসে। গ্রামের ভজু-গজুরা এখানে এসে ভজহরি গজেন্দ্রবাবুতে বদলে গেলেন। সমাজবন্ধনমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে নব উদ্দীপনায় লোকেরা ব্যবসাবাণিজ্য করে ভাগ্যবদল করে নিলেন। কিন্তু সকলের সেই সৌভাগ্য হয়নি। ফলে আলোর নিচে প্রলম্বিত অন্ধকারের মতো তারা দু'অ ানা চারআনা মজুরির মোটবাহক কুলির কাজে লেগে পড়েছিল। বিনা মূলধনে নগদ আয়েরই এটাই হয়তো ছিল সুবিধাজনক রাস্তা। আজকের মতো সেদিনের কলিকাতার জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও অফিস পাড়ার মোড়ে মোড়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের জন্য অপেক্ষা করত এই মুটেরা। ঊনিশ শতকেরপ্রথমপাদে উকিল জনসনের বিবরণে এই মুটেদের যে ছবি পাওয়া যায় তা আজও কলিকাতায় দৃশ্যমান।

"Hundreds of them are waiting in the streets to be hired; and though, like all Hindoos, they make a most Bable – like noise over their work, and require four to carry that which one English porter would think nothing of, yet they are careful carriers, and generally trust-worthy, I had all my furniture removed to another house, three miles distant, by one hundred coolies, for whose

services I Paid twenty – five rupees." এই মজুরির কথা বাদ দিলেও সাহেব - উকিলের বিবরণীতে যে জাতগন্ধ লেগে থাকে তা সবার নজর নাও এড়াতে পারে। চারজনের কাজ করার শক্তিধর ইংরেজ লোকটা হল 'পোর্টার' আর এদেশের হিন্দুরা হল 'কুলি'।

এই বিবরণের প্রায় একশো বছর আগের দিকের ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণের সময়ে মুটেদের আয়পত্র বিষয়ে বেশ কিছু তথ্যে তাদের আরো অকিঞ্চিতকরতার ছবিটিই ফুটে ওঠে। কুলির সর্দারদের মাধ্যমে মজুরি দেওয়া নিয়ে অশান্তি দেখা দিতে সর্দারদের কমিশন কেটে নেওয়ার জন্য (কাউন্সিলের প্রোসিডিংস -১৩ জুন ১৭৫৭ দ্র,)। এই কমিশন নিয়ে অশান্তির জেরে তারা বার বার কাজ ছেড়ে চলে গেছে, ফোর্ট নির্মাণের কাজ ব্যাহত হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে কুলিদের অন্যত্র কাজ করার সুযোগ বন্ধ করে দিতে কোম্পানীর বড়সাহেবরা আদেশ জারী করে দিলেন যে কলিকাতায় কেউ ব্যক্তিগত কাজের জন্য এই মুটে মিস্ত্রিদের নিয়োগ করতে পারবে না।

"The Committee of works send in a letter to the Board informing us of the difficulty the find in getting labours and artificers for the fortification and desiring the Board will take some method to get those people to carry on the works, Ordered, their letter be entered and that they advertise no artificers shall be employed by the private inhabitants after the first day of February…" (Proceedings, Dt.13-1758).

এই কড়া সিদ্ধান্তের পরেও ঠিক মতো মজুর না মেলায় ফসল উঠার পরে যে গ্রাম থেকে বেশী সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন কেউ কেউ। কিন্তু তাতেও সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। ১৭৬০ সনেও তোই কালেক্টরকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে আরও ৮,০০০ লোক সংগ্রহ করতে। কিন্তু এই দুর্গ নির্মাণের জন্য কালেক্টরের সাহায্য চাওয়াটা একটা ভিন্ন দিকেরও ইঙ্গিত করে। সম্ভবতদুর্গমিাণে বেশী সংখ্যাক লোক এগিয়ে না আসায় বলপ্রয়োগের দ্বারা নিকটবর্তী এলাকাগুলি থেকে দরিদ্র অসহায়শ্রেণীর লোকদের ধরে এনে এই শ্রমিকদের কাজ করানো হতো।

কাজেই পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ধাপে মদগর্বী ইংরেজদের পক্ষে এসব কাজ যে অসম্ভব ছিল না তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কোম্পানী বাহাদুর অবশ্য একটি ক্ষেত্রে কুলি ও মুটেদের ব্যাপারে কিছু দয়া দেখিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। বোর্ডের এপ্রিল ১৭৫৭ এর সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে যে চন্দননগর অবরোধে ক্লাইভের সোনাদলের অনেক কুলি ও মুটে নিহত হয়। যুদ্ধে নিহত ও আহত কুলি ও মুটেদের পরিবারবর্গকে এককালে ৮/১০ টাকা করে সাহায্য করার সুপারিশ করেছিল বোর্ড। (কলিকাতা / সেকালের ও একালের)

তাদের যে কি সামান্য মজুরীতে এই কাজ করানো হতো তা ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল ভরাট করে বর্তমানের ত্রীক রো তৈরী সময়ে কুলি খাতে যে ব্যয়বরাদ্দের হিসাব ধরা হয়েছিল তাতে স্পষ্ট হয়। সে সময়ের কুলিমজুরদের মজুরির যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, চারমাসে এই খাল ভরাট করতে ২০০ কুলির পিছনে মোট ৩০০ টাকা, অর্থাৎ মাসে ৭৫০ টাকা হিসাবে খরচের খতিয়ান তৈরী করেছিল সেই কমিটি। সেই হিসেবে কুলি পিছু মাসিক খরচ দাঁড়ায় ৩ টাকা ৮ আনা অর্থাৎ চৌদ্দ সিকি, দৈনিক হিসেবে দু'আনারও সামান্য কিছু কম। এই হিসেব ২০ জুলাই ১৮২০ সালের। সেই হিসেবে জনসন উকিল আরও ১৫/২০ বছর পরে দৈনিক ৪ আনা আয়ের সুযোগ দিয়েছিলেন তার আসবাব সরানোর কুলিদের, তাকে তো দরাজ দিলের লোকই বলা যায়!

কিন্তু যারা বাধ্যহয়ে এই কাজে যোগ দিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই কুলিসর্দারের অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে পালিয়ে গ্রামে গিয়ে চাষবাসের কাজে মন দিয়েছিল। কিন্তু ভূমিহীন দরিদ্র বিহারবাসীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি বলে এই দুই কর্মে তারাই থেকে গেছে। এরাই ক্রমশ এই বিশেষ পেশাটিতে প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়ে কলিকাতা শহরের স্থায়ী আশ্রয়বিহীন স্থায়ী নাগরিকে পরিনত হয়েছে, ছাতু আর কাঁচা লঙ্কা খেয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে বাবুদের বাড়ি গাড়িবারান্দা ও সরকারী দপ্তরের করিডোরে ঘুমিয়ে।

।। শিল্পশ্রমিক ।।

কলিকাতার নগরায়ণের প্রথম একশত বছরে শিল্পায়নের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি, তবে গাড়ি পাল্‌কি গৃহনির্মাণের জন্য কারিগর শ্রেণীর প্রভূত লোকের আগমন ঘটেছিল নগর কলিকাতায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংগঠিত ভাবে যে কলকারখানার পত্তন, তা হতে আরও বেশ কিছু সময় লেগেছিল। মানুষের কায়িক শ্রমের বিকল্প হিসেবে যন্ত্রযুগের যে শু, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আগে শু হয়নি। সেকালের সংবাদপত্র মারফৎ প্রতিদিন " কেবল দুইজন লোকে দশ মোণ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে" এমন যন্ত্রের কলিকাতায় আগমনের খবর পাই। "কাষ্ঠনির্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিস্পাদক" এমন যন্ত্রে প্রথম প্রয়োগ দেখতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৬ বুধবার তারিখে 'এগ্রিকলটিউর সোসাইটি'র সভায় বহুলোকের সমাগম হয়েছিল। ৮ আগষ্ট ১৮২৯ তারিখের আর একটি সংবাদে জানা যাচ্ছে যে মাসাবধি কাল ধরে গঙ্গার তীরে 'ত্রিশ অশ্বের বল - ধরি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের' সাহায্যে একটি অদ্ভুত কল প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয়েছে। "এই কল দ্বারা গোম পেশা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে। ...এই অদ্ভুত যন্ত্রবাষ্পে দ্বারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে..."। দুটি সংবাদই পাওয়া যায় সমাচার দর্পণে। ১৮ আশ্বিন ১২৬০ ঐ পত্রিকা বহুবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের হৌসে আমেরিকা থেকে আনীত ছয়টি 'অত্যাশ্চর্য নূতন কল' আনয়নের সংবাদ দেয় যারা দ্বারা স্বল্পকালেই জামা, চাপকান, ইজার, পেন্টলুর ও গনিচটের ব্যাগ সেলাই কলা যাবে। এই সব যন্ত্র দেখতে সেকালে কতই না লোকের সমাবেশ হচ্ছিল।

এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে নগরে শিল্পায়ন তখনও শু হয়নি। কিন্তু গ্রাম থেকে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের স্রোত শহরমুখী হচ্ছিল। ব্রিটিশ - নীতির ফলে এদেশে তাঁতশিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় রোজগারের সন্ধানে কর্মহীন লোকেরা ভাগ্য ফেরাতে শহরে আসতে শু করেছিল। 'শহরে টাকা ওড়ে' এই প্রবাদের আকর্ষণেও শহরে গ্রামীণ মানুষের ঢল নেমেছিল সেই আদি পর্বে। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে, বৃহৎ কর্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানা দিগদেশগামি হইতেছে, নানাবিধ মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে'। এই শহরের নাকি 'ধনমত্তাদির' কল্লোল শোনাযেত সাগরের মতো। এখানের পথের ধুলোও ভোজবাজির মতো সোনা হয়ে যেতো ভাগ্যবানের হাতে পড়লে। কুলুই চন্দ্র সেনের 'ধন্য ওহে কলিকাতা' কবিতায় বাঙালীদের কলিকাতায় আসার পিছনে যে সব কারণ দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল "রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে / ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়া বাস করে।"

সন্দেহ নেই, এদের অনেকেই পরে বড়লোক হয়েছিলেন। তাদের পরিবারের তা নিয়ে অহংকারও কম ছিল না। গিন্নীরা এর নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতো 'কেহো কহে পতি মোর ব্যাঙ্কের পোদ্দার / আর যা বেনে আছে তার তাঁবেদার। / ...টাকা সে ভালো চেনে আর কিছু নয়?" তারা নিজেরাও টাকাপয়সা বেশ কিছু করেছিল। নইলে অন্যের টাকাপয়সা গুণে কি হবে! 'দূতিবিলাসের' কবি ভবানীচরণ তাই লিখছেন, 'কহে কোন কামিনী করিয়া অহংকার / মোর পতি অত বড় ঘরে তবিলদার / কতলোকে টাকা দেয় থেকে পায় / রেতে এসে ঘরে বৈসে মজুদ মিলায়।'

এভাবেই নানা ধরনের লোক এসে ভীড় করে তুলল এই শহরে। হুতোমও ধনী-দরিদ্র, সৎ- অসৎ, ভণ্ড - প্রতারকের সহাবস্থান দেখলেন এই আজব শহরে।

রেলপথে শহরতলীর সাথে যোগাযোগ শু হলে মফস্বল থেকে প্রতিদিন অনেক লোক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরে এসে ভীড় জমাতে লাগল।
ক্রমশ শহর এলাকার মধ্যেই গড়ে উঠতে লাগল শিল্পকারখানা, ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপ। এর মধ্যে চর্মশোধন, রাসায়নিক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, কাচ, রং, জুতা, সাবান, পোষাক প্রস্তুত, লৌহ ও ঢালাই কারখানায় প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হতে লাগল। আগে অনেকগুলি পাট ও কাপড়কল শহরের চারপাশে ছিল বলে ঐগুলিকে কেন্দ্র করে অনেক বস্তিএলাকাও গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমেভিন্নরাজ্য থেকে জনসমাগমে কলিকাতা শুধু সর্বভারতীয়ই নয়, কসমোপলিটান রূপ পেতে লাগল। শহর কলিকাতায় বাঙালী বাদ দিলে জনসংখ্যার ক্রমানুসারে অন্যান্যরা হল বিহারী, মারওয়ারী, ওড়িয়া, অ্যাংলা - ইন্ডিয়ান,চীনা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, মারাঠী, পার্শী, নেপালী আর্মেনিয়ান ও আফগানী। তখন কবিতা লেখা হল---"এলো মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, উড়িষ্যা, বেহারী ও মাদ্রাজী,/ এলো পাঞ্জাবী, এলো চীনাম্যান লুটিয়া লইতে বাজী।" (ক্যালকেশিয়ান / প্রভাতকিরণ বসু) অন্যান প্রদেশের লোকদের সংখ্যা এতই বেশী হয়েছিল যে ১৯৬০ সালে কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের মূল অংশই দেখা যাবে ভিন্ন রাজ্যের

পাটকল ৭৯ শতাংশ
বস্ত্র শিল্প ৫৪ শতাংশ
ইঞ্জিনিয়ারিং ৪৭ শতাংশ
লৌহ - ইস্পাত ৬৪ শতাংশ
কাগজ কল ৭৩ শতাংশ (Calcutta -20th Century-P- 111)
এই সময়ের বহিরাগত জনসংখ্যার একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ১৯৬১ সালের সেনসাস রিপোর্টে

বাঙ্গালী ৩,০৯,৮৫৬
বিহারী ৩,৪৫,০০৯
উড়িয়া ৫৬,৭৭৭
রাজস্থানী ৩৬,২১২

১৯৫১ থেকে ৬১ সালের মধ্যে পশ্চিমভারত থেকে ২৪,০০০, আসাম থেকে ৫,০০০, দক্ষিণভারত থেকে ১৬,০০০, উড়িষ্যা থেকে ৩৩,০০০, উত্তরপ্রদেশ থেকে ৭১,০০০, বিহার থেকে ১,৮৩,০০০ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জিলা থেকে ১,৬৮,০০০ হাজার লোক কলিকাতায় আসে। ১৬৬৯ সাল পর্যন্ত ১৩ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফলে ১৯৭৪ সালে কলিকাতাবাসীর সংখ্যা হয়ে গেল মোটামুটি ৩৩ লক্ষ। ক্রমশ লোকসংখ্যা এতোটাই বেড়ে গেল যে ১৯৯১ সালে প্রতি বর্গ কি. মিতে লোক হল গড়ে ৩৩,০০০ জন।
আর আজ বিশ্বের জনবহুল শহরগুলির হিসেবে কলিকাতার অবস্থান নবম স্থানে। মোটমুটি হিসেবে বৃদ্ধির হার ঠিক থাকলে২০১৫ সালে এই সংখ্যা সামান্য হেরফের ঘটবে এবং তাতে কলিকাতার অবস্থান ১১তম হবে বলে ধারনা। এখানে বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরগুলির বর্তমান লোকসংখ্যার সাথে সম্ভাব্য বৃদ্ধির একটা হিসেব বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল

টোকিও ২৬.৬ মিলিয়ন (২৮.৭)
নিউ ইয়র্ক ১৬.৩ মিলিয়ন (১৭.৬)
সাওপাওলো ১৬.১ মিলিয়ন (২০.৮)
মেক্সিকো সিটি ১৫.৫ মিলিয়ন (১৮.৮)
সাংহাই ১৪.৭ মিলিয়ন (২৩.৪)
বোম্বে ১৪.৫ মিলিয়ন (২৭.৪)
লসএঞ্জেলেস ১২.২ মিলিয়ন (১৪.৩)
বেইজিং ১২.০ মিলিয়ন (১৯.৪)
কলিকাতা (বৃহত্তর) ১১.৫ মিলিয়ন (১৭.৬)
সিওল ১১.৫ মিলিয়ন (১৩.১)
জাকার্তা ১১.৫ মিলিয়ন (২১.২)
ওসাকা ১০.০ মিলিয়ন (১০.৬)
তিয়ানজিন ১০.৬ মিলিয়ন (১৭.০)
করাচী ৯.৪ মিলিয়ন (২০.৬)
ঢাকা ৭.৯ মিলিয়ন (১৯.০)
লাগোস ১০.৮ মিলিয়ন (২৪.৪)
দিল্লী ৯.২৯ মিলিয়ন (১৭.৬)
জ্ঞতথ্য UNFPA/ MTTFV; Page 134]

এই হিসেব অনুসারে টোকিওর স্থান এগিয়ে থাকবে ভবিষ্যতেও। পক্ষান্তরে এই সময় জাকার্তা, লাগোস, ঢাকা, করাচী প্রভৃতি শহরের লোকসংখ্যাও অসম্ভব বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অপ্রতিরোধ্য এই জনসংখ্যাই হয়ে উঠল কলিকাতার উন্নয়নের পরিপন্থী। কিন্তুআশার কথা, ১৯৭০-৭১ সালের পর থেকে বহিরাগতের আগমনের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে বাইরের লোকএসেছিল ৮৭,৭৯০ জন, সেখানে ১৯৭০-৭১ সালে বহিরাগতের সংখ্যা হল ১৫,১৪০। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ কমে যাচ্ছিল এবং দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গলোরে নতুন শিল্পায়ন ও শহরের সম্পাসারণের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল রাজ্যগুলির লোক সেই লক্ষ্যে ছুটতেলাগল।

শিল্পকারখানায় কর্মসংস্থানের বাইরেও নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী এক এক রাজ্যের লোক স্বতন্ত্র পেশায় যোগ্যতা অর্জন করেছে। ক্রমে পাঞ্জাবীরা ট্যাক্সিচালক, পরিবহল ব্যবসা, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, মোটপার্টস, আতসবাজীর ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত। একসময় দ্বারোয়ান হিসেবে ভোজপুরীদের সাথে শিখরাও এই শহরে কিছুটা গুত্ব পেয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন 'ওই দেখ রাজেন্দ্র - মল্লিক রম্য - বাড়ি, / দ্বারে শিখ দ্বারবান ভয়ানক দাড়ি,' (সুরধুনী কাব্য)।

কলিকাতার প্রথম চীনাদের আগমন সংবাদ জানা যায় ১৭৮০ সালে। তখন সুদূর চীন থেকে এদেশে এসে ইয়ং আছি চিনি তৈরীর জন্য হেস্টিংসের কাছ থেকে ৬৫০ বিঘা বার্ষিক ৪৫ টাকা খাজনায় নিয়ে আখের চাষ শু করে। এই জায়গা তার নামানুসারে পরে আছিপুর নামে পরিচিত হয়। ইয়ং -এর এই পরিকল্পনা সফল না হলেও জাহাজ পালানো ম্যাকাও চৈনিকদের কলকাতা বাসের খবর পাওয়া যায় যারা খালাসিটোলায় জুতা তৈরীর কাজে ইংরেজদের প্রিয় হয়ে উঠছিল। এই শতকের প্রথম দিকের কলকাতার খবরেরকাগজে চীনাদের নানা খবর জানা যায়। দ্বিতীয় ঝি যুদ্ধের পরেও দেশ ছেড়ে চীনাদের আগমন অব্যহত ছিল। ১৯৫১ স ালের জনগণনায় কলিতাতায় ৫,৭১০ -এ পৌঁছে গেছে। কলিকাতার চীনারা জুতানির্মাতা, চামড়াশোধন, ছুতোর, হোটেল রেস্তোরাঁ, লন্ড্রী ও রূপচর্চার ব্যবসায়ে স াফল্য অর্জন করেছে। কেউ সাফল্য পেয়েছেন দন্তচিকিৎসক হিসেবে।

স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই কলিকাতাকে কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিচ্ছিল অনেক লোকে। যেমন, রেলপথ দিল্লী পর্যন্ত বিস্তারের পরে রাজস্থানের মারোয়ারী সম্প্রদ ায় কলিকাতায় আসতে লাগল ব্যবসাবাণিজ্যের মুলুক সন্ধানে। বঙ্গভঙ্গের ফল হিসেবে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুমুসলমান বিভেদ প্রখর হয় এবং কোন কোন অঞ্চলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেখা দেয়। তার ফলে পরিবারের ধনসম্পদ এবং বাড়ির মহিলাদের পক্ষে কলিকাতা নিরাপদ হবে ভেবে অনেকে এখানে চলে আসেন। পরে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও অনেকে আর ফিরে যেতে চান নি। তারা ছাড়াও ধনিক বণিক শ্রেণীর আপিসে - গদীতে কাজ করার জন্য স্বল্পবেতনের অল্প শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা কেরাণী মুহুরীর কাজের সন্ধানেও শহরের গলিতে ভীড় জমিয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই যশোর থেকে অনেক লোককে তাঁদের পারিবারিক কাজের জন্য কলিকাতায় এনেছিলেন।

এদিকে ইউরোপীয়দের সংসর্গে এদেশীয় রমণীর গর্ভে জাত সন্তানেরা সমগ্র কলিকাতায় একটা বিশেষ জনসম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। ইউরোপীয় নারীরা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যায় দল বেঁধে কলিকাতা আগমনের আগে এই নারীদের গর্ভে জন্মানো সন্তানদের কিছু সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতিও মিলত। পুরানো কবরখানায় একটি মৃত শিশুর কবরের ফলকে খোদিত উদ্ধৃতি থেকে যে সংবাদটি পাওয়াযাচ্ছে, তাতে সমাজে তাদের অবস্থানের কিছুটা মর্যাদার কথা অনুক্ত থাকে না। অষ্টাদশ শতকেতর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ভাবটি বজায় ছিল বলে মনে হচ্ছে। এর পরে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বেড়ে গেলে এই দোআঁশলা শ্রেণীর লোকগুলির সামাজিক মর্য াদা যথেষ্ট হ্রাস পেল।

তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়াশুনার সুযোগ কমে যেতে লাগল, চাকুরীর সুযোগও তাদের হাতছাড়া হল অনেকটা। কিন্তু ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহে তারা ইংরেজপক্ষ সমর্থন করায় আবার তাদের পুলিশ, মিলিটারী, কাস্টমস্, রেল, চিকিৎসা এবং মেয়েরা নানা ও শিক্ষাবিভাগে কাজ পেতে লাগল। এদেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরে আবার তীব্র প্রতিযোগিতা শু হল। তবে তাদের মেয়েরা সরকারী বেসরকারী দপ্তরের প্রাইভেট সেক্রেটারী, টাইপিস্ট, স্টেনো, রিসেপশনিস্ট, নার্স, স্কুলশিক্ষিকার পেশা ধরে রাখলেন অনেক দিন পর্যন্ত। দেশ স্বাধীন হবার পরে যাদের সামর্থ্য সুযোগ ছিল তারা অনেকে ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডায় চলে যায়। বর্তমানে যারা এখানে থেকে গেছেন, তাঁদের অনেকেরই বর্তমান অবস্থা বেশ শোচনীয়।

নেপালীদের কলিকাতায় প্রধান কারণ এখানে কর্মসংস্থান। তাদের সামান্য অংশই আসে উচ্চশিক্ষার জন্য। পর্বতময় ক্ষুদ্র দেশটিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ অতি কম বলে নিকটবর্তী কলিকাতা ও দিল্লীতে চলে আসে। কঠোর পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, মৃদুভাষী ওই জনসম্প্রদায় ঝিস্ত বলে বিশেষ মর্যাদা পেত। প্রধানত দ্বারোয়ান, নির াপত্তাকর্মী, গ্যারেজকর্মী, ড্রাইভার, ঠেলাচালক হিসেবে তারা কাজ করে। বাহাদুর দারোয়ান বলে এদের আলাদা একটি স্থান আছে। ইদানীং এদের ঝিস্ততা নিয়ে অনেক প্রা দেখা দিচ্ছে। দুর্ভাগ্যেরবিষয়, নেপালী মেয়েরা বাংলাদেশী মেয়েদের সাথে মিলে ভারতের প্রধান প্রধান নগরের পতিতা পল্লীগুলিতে যৌনব্যবসায়ে লিপ্ত। দারিদ্র্য আর আশিক্ষার সুযোগ নিয়ে আড়কাঠিরা কাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অধিকাংশ সরলমতি নাবালিকাদের মহানগরে নিয়ে এসে মাসীদের কাছে বেচে দিচ্ছে।

শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার আদি বনেদি ব্যবসায়ী শেঠ বসাকেরা নবাগত জনতার নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগলেন। নবাগতেরা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা বাদেও দেওয়ানী, সর্দারী, পোদ্দারী, মুৎসুদ্দীগিরি করে হঠাৎ যেমন বড়লোক হয়ে যেতে ল াগলেন তেমনি নিম্নবর্গের মানুষেরাও তাদের পেশায় অন্য লোকের প্রবেশে নতুন পেশার সন্ধান করতে লাগলেন। ৯-১-১৮৩০ এর 'সমাচার দর্পণ' এ এমনই এক বিপর্যয়ের খবর পাই।

"অভাগা বাঙালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ী বান্ধিয়াছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে হইল এখনে অন্নাভাবাপন্ন ইত্যাবধানে বিবেচনা করিতেছি ইঙ্গরেজ লে াক রাজমিস্ত্রীর কর্ম্ম করাতে এদেশীয় মিস্ত্রীরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে।" এভাবে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েই বাঙালীরা ক্রমে ক্রমে পৈত্রিক পেশা ত্যাগ করে যে - কোন ভ াবে জীবিকা নির্বাহের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু পরবর্তী শিল্পায়নের যুগে দেখতে পাই, বাঙালীরা তীব্র কায়িক পরিশ্রমের চটকল ও রাসায়নিক শিল্পে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ না করলে সেইস্থান দখল করে নিল বিহার উত্তর প্রদেশাগত লোকেরা।

এভাবে কর্মসংস্থানের সন্ধানে আগত লোকদের প্রাচুর্যে তাদের শোষণের উপায়ও তৈরী করে নিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি।তারা কোন কারিগরী বা ব্যবসা পরিচ ালনায় উপযুক্ত কর্ম পাবে না বলে তাদের যতোটা সম্ভব কম মাইনে দিয়ে বেশী করে খাটিয়ে নিতে লাগল। যারা সপরিবারে কলিকাতায় আসেনি তার আয়ের উদ্বৃত্ত াংশ দেশে পাঠিয়ে ছুটিছাটায় গ্রামদেশে যেতেন। ফলে শহরে পরিবারহীন পুষের সংখ্যা গেল বেড়ে। একারণের শহরে পতিতাবৃত্তির প্রসার ঘটল। ১৯১১ সালের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে বহিরাগতকাজকর্মে লিপ্ত পুষদের মধ্যের প্রায় ১/' অংশই বেশ্যাগমনে অভ্যস্ত।

১৯৫৯ সালের একটি তথ্য থেকে কলিকাতার পেশা ভিত্তিক জনবিন্যাসের যে ধরন পাওয়া যাচ্ছে তা নিম্নরূপ

পেশা	শতকরা হার
দক্ষ প্রকৌশলী	৮.৭
কৃষি সংক্রান্ত	০.২
করণিক	১৬.৩
দোকানকর্মী	১৭.৪
কায়িক শ্রমিক	১৩.২
কলেকারখানায় মজুর	১৯.১
অসংগঠিত ক্ষেত্র	.০৩

যান্ত্রিক উৎপাদনে নিয়োজিত ২.৪
ম্যানেজার ইত্যাদি ৪.৮

।। রিকশাওয়ালা ।।

বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কলিকাতা নগরে মোট হাতে টানা রিক্সার সংখ্যা ১৮,০০০। 'ট্রিস্তব্ধনক্ষ ট্রুনস্তু চস্তন্ত্র'- র মতো শহরে মোট রিক্সাওয়ালার সংখ্যা ১৮,০০০ হলেও কারো কারো মতেই এই সংখ্যা ২৪,০০০ হতে পারে। কারো কারো মতে ১৯ শতকে চীনার শু করেছিল এই হাতে টানা রিকশা। বর্তমানে অন্তত এক লক্ষ লোকের টিজি নির্ভর করে এই রিক্সার উপর। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ রিক্সাওয়ালাই বিহারী। বাগীদের ১১ শতাংশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এবং ব াংলাদেশী। বাকী ৯ শতাংশ হল পশ্চিমবঙ্গের। এরা শ্যামবাজার, হাতিবাগান, শোভাবাজার, বউবাজার, কলেজস্ট্রীট, বড়বাজার, শিয়ালদা, তালতলা, মৌলালী, নিউমার্কেট, ভবানীপু, কালীঘাট, গড়িয়াহট, বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর অঞ্চলে রিক্সা চালায়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমান রিক্সাচালকদের গড় বয়স ৪৫ বছরের বেশী। তাদের বাৎসরিক আয় ২৭,০০০ থেকে ৫৪,০০০টাকার মধ্যে। এর মধ্যে থেকেই সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেশের টাকা পাঠাতে হবে বৌ - বাচ্চার ভরণপোষণের জন্য। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাতাদের বার্ষিক খরচের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে (তাং ১৩-০৮-২০০৫)। তাদের সমীক্ষা অনুসারে কলিকাতার রিক্সাওয়ালাদের বাৎসরিক খরচের হিসাবটি এমন -- খাদ্যবাদক ১০,৮০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা, রিক্সার ভাড়া ৪,৮০০ থেকে ৯,০০০ টাকা, পুলিশকে প্রণামী ২,৪০০ থেকে ৯,০০০ টাকা, পুলিশকে প্রণামী ২,৪০০ থেকে ৬,০০০ টাকা, রাত্রিবাস স্নান ইত্যাদি বাদ ৯০০ থেকে ১৮০০ টাকা, ঔষধপত্র ৬০০ টাকা থেকে ৪,৮০০ টাকা, নেশা, ফূর্তি ইত্যাদি খাতে ১,৫০০ থেকে ৩,৬০০ টাকা। এই তথ্য কতোটা পরিসংখ্যান ভিত্তিক আর কতটা মনগড়া, তা বোঝা না গেলেও এ ভাবেই চলছে বলে ধরা যায়। তবে একথা ঠিক যে বহিরাগত রিক্সাওয়ালদের নিজস্ব কোন থাকার জায়গা নেই। তারা দলবেঁধে সর্দ ারের ডেরায় রাত কাটায় বা পাহারাওয়ালাদের পয়সা দিয়ে কোন সরকারী অফিসের রারান্দায় রাতের সুখটুকু ভোগ করে সকালে পায়খানা বাথম স্নান সেরে র াস্তায় নামে। এলাকার সর্দারদের কাছ থেকেই এরা রিক্সা ভাড়া নেয়, সর্দার তা জোগাড় করে রিক্সার আসল মালিকদের কাছ থেকে। এই সর্দাররাই ছুট্‌কোছাটকা ঝামেলা - দুর্ঘটনায় রিক্সাওয়ালার পিছনে দাঁড়ায়, পুলিশ চালান করে দিলে নিজস্ব লাইন ধরে সে রিক্সা ছাড়িয়ে আনে। সর্দাররাই মহানগরীতে তাদের মহান পরিত্র াতা।

পরিবারবিহীন থাকে বলে একাকীত্ব কাটাতে মাঝে মধ্যে নারীসঙ্গের জন্য তারা নিষিদ্ধ পল্লীতে ছোটো, আর অক্লেশে এইডস্‌ সহ অন্যান্য যৌনরোগের শিকার হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে চর্মরোগ ও অর্শে ভোগে অনেকেই। খাদ্যাভ্যাস, ঠিকমতো জলপান, মলমূত্র ত্যাগের সমস্যা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রা ত্রিবাসই তাদের নানা জটিল রোগের কারণ। অর্থাভাবে সময়ে ভালচিকিৎসা সম্ভব হয় না প্রায়ই।

কলিকাতার রিক্সা নিয়ে স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ অনুসারে সভ্য দুনিয়ার এমন অমানবিক চিত্র আর হতে পারে না। মোট ভারী শেঠজী রিক্সার উপর পা তুলে বসে আছে, আর লিকলিকে শীর্ণ, অসুস্থ রিক্সাওয়ালা কোনত্রমে কষ্টে তাকে টেনে নিচ্ছে, এমন কার্টুন সবারই চোখে পড়েছে। আবার অ্যাংলো - ইন্ডিয়ান তন্বীকে রিক্সায় তুলে ফুরফুর মেজাজে রিক্সাওয়ালা ঠুন ঠুন করে চলছে, তন্বীর উন্মুক্ত শ্রীচরণের উপর স্কার্ট উড়ছে, এমন রে ামান্টিক ছবিও চোখে পড়ে থাকবে। 'সিটি অফ জয়' এর শুটিং এর সময়ে সত্যজিৎ রায়কে একবার এই টানারিক্সায় চড়ানোর জন্য চিত্রাভিনেতা ওমপুরী একদিন সকালে রিক্সাওয়ালার বেশে রিক্সা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিশপ লেফ্রয় রোডে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় চিনতে পারেন নি হাসারীপালবেশী ওমপুরীকে। পরিচালককে রিক্সায় তুলে তার অভিনয় দক্ষতা প্রমাণের ওমপুরীর সেই সাধ তাই অপূর্ণ থেকে গেছে।

১৯৯৬ সালে একবার কলিকাতা থেকে রিক্সা তুলে দিয়ে রিক্সাওয়াদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,০০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও সেই টাকা নেওয়ার জন্য কেউ আসে নি। মহানগরীকে আরও বেগবান করে তোলার জন্য আগেও দু'চার বার এই পেশা বন্ধকরে দেবার ধমক শোনানো হলেও এতদিনে অসারের তর্জনগর্জন ভেবে রিক্সাওয়ালারাও খুব একটা ঘাবড়ে যায় নি। শহরের ঘিঞ্জি গলিঘুঁজির মধ্যে যেখানে বাসট্রাম তো দূরের কথা, ট্যাক্সি ঢোকানোর পথ পায় না ড্রাইভার, দোক ানপাটবহুল বড়বাজারের মতো এলাকায় তো তাহলে ডুলি বা ঝাঁকামুটের মাথায় বলেই যাতায়াত করতে হয়। এই ভরসায়ই এতোকাল কলিকাতার রিক্সাওয়ালারা বহাল তবিয়তে চালাচ্ছিল হাতের ঘন্টি ঠুন ঠুন করে। এবার খোদ মন্ত্রী এবার উল্টো সুর গাইছেন। আর সবাই জানে মুখ্যমন্ত্রী ও পরিবহণ মন্ত্রীরডুয়েলে পার্টির গুলি গিয়ে কার বক্ষভেদ করবে! নিজের সাবালকত্ব প্রমাণ করতে দুই পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে আসতে অভ্যস্ত হয়েগেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। পার্টির কাছে ক ার গুত্ব বেশী তা তো কারো অজানা নয়!

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রিক্সাকে পশ্চিমী দুনিয়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে অমানবিক যান বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ১৫ জুলাই পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চত্রবর্তী যখন এই বাহনটি পয়লা জানুয়ারী ১৯৯৭ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন, সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়া যেন এ নিয়ে হঠাৎ ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের চিন্তা হল, বাঙালীর কলিকাতা থেকে ২৫,০০০ বিহারী রিক্সাচালকদের তুলে দিয়ে ৭৫,০০০ লোককে ভাতে মারার চত্রান্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট সরকার। 'লস এঞ্জেলস টাইমস'-এ জন হরদলবার্গ লিখলেন---

Every day, for 12 hours on and average, Ayodhya, a Calcutta slum dweller, turns himself, his wife and three children … the illiterate economic migrant from Bihar, Indian's poorest state, clears around $2 … Ironically, ridding the city of rickshaws is an act planned by the Communist Party of India, Markist, which rules in the name of the working class … since most pullers, like Ayodhya, are from the neighboring ব্দব্ধব্ধব্দন্দ ঙ্সন্দ্র চন্ড্রব্জ,ন্দ্বব্দব্ধ চন্দ্রুন্ধপ্ত'ব্দ প্তন্দ্রস্তন্দ্বজব্দ নক্ষঙ্গজন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্বপ্প. ছ৭.৯.১৯৯৬গ্ন

এদিকে Sunday Telegraph- ও লিখল 1.9.1996 'A scheme is in ;lace or rehabilitation … the rickshaw pullers … will benefit only 5000 rickshaw licensed before the police stopped issuing permits in 1935'.

বলা বাহুল্য, এদেশে টানা রিক্সার প্রচলন কম্যুনিস্ট পার্টির জন্মেরও এক শতাব্দী আগে থেকেই হয়েছিল, বিদ্বেষপ্রসূত ভাবে সে তথ্যও ভুলে গেল এই মানবদরদী পশ্চিমী দুনিয়া!

তবুও যদি এবার, না হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই বাহনটিকে শহর থেকে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাহলে একটি দীর্ঘদিনের ইতিহাসের যবনিকাপাত ঘটবে। সেই কবে চীনেম্যানারা কলিকাতায় দ্রুতগামী যানবাহন এড়িয়ে হাতের উপর সম্পূর্ণ গতির নিয়ন্ত্রণ রেখে নিরাপদ এই যানটি চালু করেছিল। তারা এই মডেলটির কথা ভেবেছিল চীনদেশে প্রচলিত রিক্সার কথা মাথায় রেখে, যেখানে যাত্রীদের সামনে বসিয়ে পিছন থেকে প্যাডেল করে যানটিকে এগিয়ে নেওয়া হয়। এখন আর কোন

চীনেম্যান রিক্সাওয়ালার দেখা যাবে না এ শহরে। তাদের স্থান দখল করে নিয়েছে বিহারের দেহাত থেকে আগত দরিদ্র মানুষেরা।
কিন্তু এবার থেকে অমানবিক যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থাটির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে। তাই যদি হয় তাহলে এই ১৮,০০০ হতদরিদ্র ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষের পরিবারের কি ঘতি হবে? এই পঁয়তাল্লিশোর্ধ বয়সে তাদের পক্ষে নাকি নতুন কোন চত্রযানের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হবে। পুরসভা ভোটের আগে বলা হল, আগামী চারপাঁচ মাসের মধ্যে পৌরসভা, পুলিশ ও সরকার মিলে এদের জন্য কিছু একটাকরবে। 'সিটি অফ জয়' এর চরিত্ররা তাহলে এখন বিলুপ্তির দিকেই এগাবে?

হকার
নগরপত্তনের শু থেকে বাজার প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুত্ব দেওয়া হয়নি। সাহেবদের সুবিধার জন্য ১৮৭৪ সালে স্টুয়াট হগ হগ মার্কেট বা বর্তমানের নিউমার্কেট স্থাপন করে। উত্তরে দক্ষিণে এবাবে বেশ কয়েকটি বাজার স্থাপন হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। ১৯৭৫ সালেও শহরের ১৫০ টি বাজারের মধ্যে মাত্র ১০টি ছিল কর্পোরেশনের। দিল্লীনগরীর নানা অঞ্চলে এখনও সাপ্তাহিক হাট বসে শহরের মধ্যেও একটি গ্রাম্য পরিবেশ তৈরী করে। কলিকাতায় সেই সাপ্তাহিক হাট বিলুপ্ত হয়ে গেলেও প্রায় সর্বত্রই সকাল সন্ধ্যা রাস্তা জুড়ে বাজার বসে। এব্যাপারে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে কোন ভেদ নাই। সমগ্র কলিকাতাকেই একটা বাজার বলে চালানো যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও একধরনের এক বাজারের কথা বলেছিলেন তার কমলাকান্তের দপ্তরে। তবে তা ভিন্ন অর্থে।
কলিকাতা শহরের ফুটপাত, ময়দান দখল করে যে কতো লোক সংসারযাত্রা নির্বাহ করে সেরকম কোন তথ্য কোথাও নেই।কারো কারো মনে এই সংখ্যা ১,৩০,০০০ এর কম নয়। শহরের ১৫০টি বাজারের মধ্যে মাত্র ১০টি বাজার কর্পোরেশনের। বাজারের সংখ্যা কম বলেই হকাররা রাস্তা জুড়ে পসরা সাজিয়ে বসে। এদের অর্ধেক বসে স্থায়ী দোকানঘরে আর বাকীরা জায়গা পাল্টে কিংবা সকালে দোকান পেতে রাতে সব তুলে নিয়ে চলে যায়। সেকালে যেমন ছিল ফেরিওয়ালারা, তেমনি ছিল নানা পেশার লোক, সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে সব পেশা বদলে গেছে। পাহারাদার, মালি, ফেরিওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে সব পেশা বদলে গেছে। পাহারাদার, মালি, ফেরিওয়ালার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতায় বারবার এসেছে। 'ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির - ওপার থেকে / তপ্‌সি মাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।' উনবিংশ শতকের শেষ পাদে মাথায় বইয়ের ঝাঁকা নিয়ে পাড়ায় ঘুরে বিত্রি করতো সেকালের ফেরিওয়ালারা। কিন্তু এযুগে তারা ঘুরে পসরা বিত্রি করে না, পৌঁছে যায় না ত্রেতার হাতের নাগালে, তারা জায়গা দখল করে হাল্‌কা দোকান পাতে, আর সংজ্ঞা বদলে ফেরিওয়ালা থেকে হকার হয়ে যায়।
একালে তাহলে এই শহরে ফেরিওয়ালা নয়, হকারের সংখ্যা কত? কমসম করে একটি তথ্য মতে, দোকানের মালিক ও তাদের কর্মচারীরা মিলে অন্তত ১,০৪,০০০ লোক স্থায়ী হকার স্টলগুলির সঙ্গে যুক্ত। পুরআইন অনুসারে রাস্তা দখল করে বেসাতি করা বেআইনি হলেও কে শোনে কার কথা। কলিকাতার উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে একদা কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শিবপ্রসাদ সমাদ্দার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে পরামর্শের সাথে পদ্যাকারেও কৌতুকপূর্ণ নানা অভিমত এসেছিল। সেই সাতের দশকের যে চিত্র তাতে ফুটে উঠেছিল পরবর্তী ত্রিশ বছরের তাতে বিশেষ রদবদল হয়েছে বলে মনে হয় না। 'কাগতাডুয়ার দেশ' থেকে 'পাগলা দাশু' ছদ্মনামে এমন এক মজার ছড়া লিখেছিলেন একজন স্বভাব কবি--- 'কলকাতা কার? তোমার আমার / কলকাতা ভাই সকলে / যে যেখানটা পারবে রাখে আগলে নিজের দখলে।/ গড়ের মাঠটা দখল করি দাও না করি সরষে খেত।/ দখল করো কিছু সব যাহা খুশী অভিপ্রেত।/ যে কলকাতা, এ কলকাতা, কি কলকাতা দেখবে রূপ,/ রাজাই ঠুঁটো জগন্নাথ রে! রাজত্বটাই অন্ধকূপ।'' (আমি আপনি কলকাতা/ শিবপ্রসাদ সমাদ্দার)
এই হকারদের আয়পত্র, পরিবারের অবস্থা নিয়েও কিছু কিছু সমীক্ষা হয়েছে। একটি সার্ভেতে কলিকাতার ৪টি অঞ্চলের ৩০০টি দোকানের তথ্য নেওয়া হয়। এই নমুনার সংখ্যা মোট দোকানের ৩০ শতাংশের মতো। এগুলির ৯০ শতাংশই চালায় পুষেরা, কর্মচারীও সবই প্রায় পুষ। অর্ধসংখ্যক দোকানেই কর্মচারী আছে। বাকীগুলি মালিক নিজেরাই চালায়। পুষ দোকানীদের বয়স ২০-৪৫ এর মধ্যে। মহিলাদের ৩০-৪৫ বৎসর। সবারই পড়াশোনা খুবই কম। ২১শতাংশ তো একেবারে অশিক্ষিত। এদের অনেকেই আবার শহরের বাইরে থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করে। অন্তত ৪৫ শতাংশই প্রতিদিন বাস ট্রাম করে দোকান খুলতে শহরে আসে।
কলিকাতা পৌরসভা আইন, ১৯৮০ অনুসারে রাস্তায় যে কোন দোকান সাজানোই অপরাধ। কিন্তু হাল্লারাজার দেশে কে শোনে কার কথা। আইনও আছে, হকারও আছে। কিন্তু 'নতুন কিছু করো', অন্তত পাবলিককে কিছু দেখানোর জন্য কোন কোন অঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান শু হয়। দিনের বদলে রাতকে বেছে নেওয়া হয় এই অপারেশনের জন্য। ১৯৯৬ সালের ১৬ নভেম্বর রাতে এই হকারতাড়িয়ে ও তাদের স্টলগুলি হঠাৎ ভেঙ্গে দেয় কলিকাতার পুলিশ ও পৌরসভা মিলে। এর গালভরা নাম 'অ পারেশন সানসাইন'। রাতের অন্ধকারে বেশ কয়েক কোটি টাকার পণ্য ও সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যায় সেদিন। এরপর নানা মহল থেকে ফুটপাতে বসে জিনিষ বিত্রি করা নিষিদ্ধ ছিল। এবার আরও কঠোর করে ত্রুস্তত্রব্ধন্সন্দব্ধ, জন্দব্স্তন্দব্দ্মাব্ধন্তুপুন্দ ন্সজ্ঞ হ্বন্সন্সস্তব্দ ন্স্ফ স্মুব্ধন্দব্পন্দব্দ্ধ, ব্দব্ধজন্দব্দন্দব্ধ, স্মুত্রজন্স ন্সজ্ঞ ন্ধুজস্তুন্দব্ধ ন্দ্রন্সজ্ঞ স্তুন্দব্দ্মাপ্তুব্ভন্সজ্ঞ ব্ধপ্তুন্দ* -ই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। এর জন্য সংশোধিত আইনে তিনমাস জেল এবং ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
কিন্তু আইন আগের চেয়ে কড়া হলেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণেই এই আইন প্রযুক্ত হতে পারেনি। অপারেশন সানসাইনের পরে এ ধরনের আর কোন উচ্ছেদ অভিযান সরকার বা পৌরসভা কেউই করতে সাহস পায়নি শুধু ভোটের কথা চিন্তা করে। প্রতি দু'বছরে একবার কোন না কোন ভাবে ভোট এসে দোরে হানা দেয় বলে হকাররা ত্রমশ সব ফুটপাত, রাস্তা, পার্ক নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। দাদাদের ছত্রয়ায়ায় আর পুলিশকে হপ্তার রসে সিক্ত রেখে 'হকার্স সংগ্রাম সমিতি' আরও শক্তিশালী হয়েছে। নানা রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে ২৬টি ট্রেড ইউনিয়ন এখন এই সমিতির ছত্রছায়ায়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে জানা যাবে যে এই হকারদের একটি বড় অংশই বাংলাদেশ থেকে আগত বিহারী মুসলমানরা, স্বাধীন বাংলাদেশে যাদের নাগরিকত্ব স্বীকৃত নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্তানীদের সহযোগিতা দেবার পরেও পাকিস্তান যাদের গহণ করতে রাজী হয়নি, অনায়াসে তারা কলিকাতা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রের ফুটপাত, রাস্তা, পার্ক দখল করে ফল, পোষাক, ব্যাগের হরেক তৈজস সাজিয়ে বসে আছে। পুলিশও প্রশাসনের অদৃশ্য সহানুভূতি আর রাজনৈতিক দাদাদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় এদের উচ্ছেদ তো দূরস্থান,, তাদের প্রসার প্রতিপত্তিরসমৃদ্ধি এগিয়ে চলে ভূমিপুত্রদের থেকেও দ্রুতবেগে। এদের কথা ভেবেই বোধ হয় কবি লিখেছিলেন, ''...পথের দুধারে/ সাজানো বিপণি শ্রেণী বস্ত্র ফল ভারে/ উজ্জ্বল তৈজসে আর,'' (আজি এ নগরী হেরি/ প্রমথ নাথ বিশী)
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ঊনিশ শতকের ষাট সত্তরের দশকের কথা, 'তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি।' আবার অন্যত্র লিখেছেন, 'তখন জলের কল বসেনি। বেহারা বাঁকে করে কলসী ভরে মাঘ - ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবারের জল।' রামমোহন রায়ের স্নানের জন্যও ভৃত্যেরা কলসী ভরে জল সাজিয়ে রাখত। তিনি একে একে সবগুলি কলসীর জল মাথায় ঢেলে স্নান সারতেন। এখনও বিভিন্ন এলাকায় কুলি ছাড়াও জল দেবার জন্য বাঁশের বাঁকে করে টিন বা প্লাস্টিকের ক্যান ঝুলিয়ে লোকের বাড়িতে বা হোটেলে জল সরবরাহ করে একদল লোক। ১৮২০ সালের আগে পর্যন্ত ভিস্তিদের বাজারও খুব চড়া ছিল।তারপর ১৮২০ সালে জেসপ অ্যাণ্ড কোং চাঁদপাল ঘাটে পাম্পিং স্টেশনবসালে ভিস্তিদের প্রয়োজন হ্রাস পেতে থাকে। মার্কেট স্ট্রীট, রিপন স্ট্রীট এলাকায় এখনও চামড়ার মশকে করে ভিস্তিওয়ালারা জলের জোগান দিচ্ছে। শহরে এখনও রয়েছে চাবিওয়ালা, ছুতোর, কামার, শিলখোটাইকার, ঝালাইকার, বেদে, মাদারী, করাতী, চুড়িহর, পেখেরা বা মিরশিকার হাজাম শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। এরা বেশীরভাগই উত্তরপ্রদেশের লোক।

।। গণিকা / বাইজী ।।

“আজব শহর কলকাতা/ রাঁড়ি বাড়ি জুড়িগাড়ি মিছে কথার কি কেতা। .../ পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনার বেনের কড়ি/ খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।”

নগরপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহিরাগত জনসমুদয় সবাই পরিবার নিয়ে শহরে আসতে পারেননি বলে তাদের দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে নারীসঙ্গের যোগ স্থাপিত হয়েছিল। এমন কি ইংরেজ সমাজের মধ্যেই মহিলাদের সংখ্যা ছিল আশ্চর্যজনক ভাবে কম। কিন্তু তারা অর্থসামর্থেই হোক ও সামাজিক বন্ধনমুক্তির সুযোগেই হোক, নিজেরাই স্বগৃহে রক্ষিতা রেখে এদেশীয় নারীদের সঙ্গে থেকে স্বদেশের বিরহ ভুলে থাকত। কিন্তু এদেশের খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কেরাণী, চাকুরে, দালাল, ফড়ে, কর্মসন্ধানী, হঠাৎবাবু ও তাদের মোসাহেবদের পক্ষে গ্রামের পরিবারবর্গের বাইরে এখানে উপপত্নীর আয়োজন সহজ ছিল না বলেই তাদের একটু স্ফূর্তির সন্ধানে বা দৈহিক উত্তেজনা নিবৃত্তির জন্য ছুটতে হত নর্মসহচরীদের কাছে। সোনাগাছিসহ ব্যাপক এলাকায় এভাবেই গড়ে ওঠে পতিতা পল্লীগুলি। সেকালের একটি ছড়ায় পাওয়া যাচ্ছে, “ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস একবার দেখ চেয়ে। / কুল - তলায় পথের ধারে কত শত মেয়ে।” (হরিহর শেঠ কর্তৃক সংগৃহীত)

নগরীতে ভদ্রপল্লীর পাশাপাশি গণিকালয়গুলি গড়ে ওঠার একটি ভাল বিশ্লেষণ করেছেন দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর ‘আত্মজীবনচরিতে’, “তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলে বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল।”

এদেশীয়রা বাদেও সাহেবরাও একই সমস্যায় প্রথমে বারাঙ্গনামুখী হয়েছিল। ১৭০০ সালে শহর কলিকাতায় মাত্র ১২০০ জন ইংরেজ ছিল বলে আলেকজাণ্ডায় হ্যামিলটন উল্লেখ করেছেন। শতাব্দীর শেষে সেই সংখ্যা, ৪,০০০ -এ পৌঁছালেও সমগ্র শহরে ইংরেজ মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ জন। ইংরেজরা তাই এদেশীয় নারীর সাহচর্য নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৭৮০ সালের সংবাদপত্রে লেখা হয়, ‘গরমের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে কাছে রক্ষিতা রেখে দেবে।’ তবে সেই নারী ইউরোপীয় হওয়া ঠিক নয়, এদেশীয় হতে হবে। ১৮১০ সালে এক লেখক লিখলেন /[illegible] (উদ্ধৃতি - কলিকাতা অতুল সুর; পৃ.১১১)। কৌশল করে ডাক্তারের সঙ্গে যোগসাজসে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে নিজের স্ত্রীকে বিলেতে পাঠিয়েও কতো সাহেব এদেশীয় নারীর সাহচর্য করে অর্থ ও স্বাস্থ্য দুই-ই নষ্ট করে অকালে স্বর্গযাত্রা করেছেন! আমরা সলভিন্সের ছবি থেকে এদেশের সাহেবদের চারিপার্শ্বে এধরনের বিচিত্র লোকের ছবি দেখতে পাই। এই সব ছবির মধ্যে থেকে জমিদার, দেওয়ান, বেনিয়ান, সরকার, গোমস্তা, কেরাণী, মুন্সী, মুৎসুদ্দী, দালাল, চাষী, তাঁতি, জোলা, জেলে, ঘেসেরা, কোচম্যান, বেহারা, সহিস, পাইক, মশালচী, কুলি, মজদুর, খানসামা, ছাতাবরদার, হুকোবরদার, হরকরা, চাপরাসী, দরজী, দারোয়ান, ধোপা, ভিস্তি, আয়া, মেথর, বাইজীদের বেশ আলাদা করে চেনা যায় (কলকাতা অতুল সুর)।

পতিতাবৃত্তির একটি বড় কারণ যে হিন্দু ধর্মের অমানবিক কিছু সামাজিক রীতিনীতি, সে সময়ের একখানি বটতলার পুস্তিকাথেকে তা জানা যায়। এক হতভাগিনী নারী সেখানে হতাশায় নিজের দুরবস্থা ব্যক্ত করছে---- “এবার জন্মিলে ভবে বেশ্যা নাহি হব/ জবন কুলেতে জন্ম গ্রহণ করিব/ স্বামীহীন হ’লে পুন বিবাহ করিব।/ হিন্দুকুলে জন্ম আর নাহিক লইব। ... বাদসা ঘরে জন্ম করিব ধারণ।/ বাদসা ঘরে জন্ম লয়ে বিবি হয়ে রব।/ নিজ জোরে হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশ করিব।” (বেশ্যাবিবরণ নাটক / তারিণীচরণ দাস, ১২৭৬)।

অচিরেই তাই দেখা গেল, নির্দিষ্ট এলাকা বাদেও বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় এভাবে পতিতারা বসবাস শু করে দিয়েছিল। মনে হয় হুতোমের বিবরণে, তাই রসিয়ে লিখেছেন “বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরের কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য। অনেক বড়মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তঁাদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজকাল মনুমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে ... কলকেতা শহর এই মহাপুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েছে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই। হেথায়প্রতিবৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বই কমবে না।”

হুতোমের এই আশঙ্কার কারণ ছিল বই কি। ১৮৫৩ সালে শহরে বেশ্যার সংখ্যা ১২,৪১৯ থেকে ১৮৬৭ সালে হঠাৎ বেড়েদাঁড়াল ৩০,০০০-এ। আর শহরের মোট লোকসংখ্যা মাত্র সাড়ে চার লক্ষ-এর মতো। অর্থাৎ প্রতি পনেরো জন লোক পিছু একজন পতিতা! (Usha Chakraborty Condition of Bengali Women Around the Second half of the Nineteenth Century, 1963).

এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন শহরের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছিল (সাহেব বিবি গোলাম - এর কথা মনে আসতে পাবে), তেমনি শহরের পরিবেশও নষ্ট হচ্ছিল বলে তা সরকারী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। “এরা আমাদের প্রধানরাস্তাঘাটগুলিতে একধরণের মহামারী স্বরূপ। নিজেদের এমন বেহায়াভাবে প্রদর্শিত করে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও অচিন্তনীয়” (Despatch from Dr. C. Fabre, Health Office, Dt. 16.01.1867). আজ সোনাগাছি বা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের গণিকারা যেভাবে চড়া রং মেখে প্রকাশ্য রাস্তাতেই খরিদ্দারের আশায় নানা রকম ইশারা ইঙ্গিত করে থাকে, এ দৃশ্য ১৮৪৩ সালের ১লা জুনের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য়ও ছাপা হয়--- “এতন্নগরীয় কোন কোন স্থানস্থ প্রজারা পোলীসে আবেদন করেন যে বারাঙ্গণারা প্রত্যহ সন্ধ্যা সময়াবধি ১০/১১ ঘন্টা পর্যন্ত রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যে সকল কুভাষা কদর্যালাপ করিয়া থাকে তাহা আর কহিতে পারি না....”।

এই সব নারীই যে ইতর শ্রেণীর ছিলেন, তা নয়। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে শহরের প্রথম পতিতাদের মধ্যে ঘর থেকে ফুসলিয়ে আনা গৃহস্থ বধূ ও কন্যা, উচ্চবর্ণের কুমারী, হিন্দু বালবিধবারা ঘটনাচক্রে বা স্বেচ্ছায় এই কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। (Ibid : Usha Chakraborty)। কিন্তু ১৮৬০-৭০ থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়, খাদ্যাভাব হেতু নিম্নবর্গের মহিলারা এই পেশায় যোগ দিতে শু করে বলে সংখ্যাটি হঠাৎ বেড়ে গেল। ১৮৭২ সালের একটি সরকারী তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই “তাঁতী, মালি, যোগী, কুমার, কামার, চামার, সোনা বেণে, তেলী, জেলে, কৈবর্ত, ময়রা, বেদে, গোয়ালা, নাপিত” প্রভৃতি শ্রেণীর। (Home Judicial No. 156; 17th Oct. 1872).

এই হতভাগ্য সব নারীই যে সমস্ত বড়লোক বাবুদের কৃপাদৃষ্টি পেয়ে মনুমেন্টের মতো বাড়ি পেয়েছিল, তা নয়, অনেকেই বস্তিতে খোলার চালা, এঁদো নর্দমার পাশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন কাটিয়েছে। তৎকালীন সরকারী তথ্য অনুসারে এই নারীদের বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে “উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা যাঁরা নিভৃতে বাস করেন এবং স্থানীয় ধনীদের রক্ষিতা।” এরা সংখ্যায় কম। অপর অংশটি হল “কোন বাড়িওয়ালা বা বাড়িওয়ালীর তত্ত্বাবধানে থাকেন এবং খাওয়া দাওয়ার জন্য অগ্রিম ভাড়া দিতে হয়।” সেকালে যে পতিতাকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া বেআইনী ছিল না এবং সমাজের অনেক অভিজাত ব্যক্তিই পতিত

াবৃত্তির জন্য বাড়িভাড়া দিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোন একজন পূর্বপুষ ১৯ শতকের প্রথমে বৌবাজার অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ঘর সম্বলিত একটি বেশ্যালয়ে মালিক ছিলেন। (Calcutta : Essays in Urban History/ S. N. Mukherjee, 1993; সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থের পাদটীকা; পৃ ১৮৮)। বাকী একটি বড় অংশ হল "হিন্দু ও মুসলমান নর্তকী ... যারা জাতপাত নির্বিচারে খদ্দের আপ্যায়ন করে... মুসলমান, নিম্নবর্গের হিন্দু ও নিম্নস্তরের খ্রীষ্টান বারবণিতা" (সরস্বতীর ইতর সন্তান/ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অমিত যৌনাচারের মধেও যৌনরোগের মারণবীজ লুকিয়ে ছিল বলে অনিবার্যভাবেই এই নারীদের মধ্যে যৌনরোগের ব্যাপকপ্রসার ঘটতে থাকলে ১৮৬৭ সালে চৌদ্দ আইন বা "Contagious Disease Act, 1868 (Act XIV) পাশ হলে পতিতাদের নাম নথিভুক্তকরণ, নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত ডাক্তারী চেকআপ বাধ্যতামূলক করা শু হলে কলিকাতা থেকে অনেক গণিকা হেনস্থার ভয়ে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে পালিয়ে যায়। কারণ এই আইনের প্রয়োগের সুযোগে চিকিৎসক ও পুলিশেরহাতে তাদের হয়রানি বেড়ে যায়। এর আগেই 'সম্বাদ ভাস্কর' (৯ - ৮-১৮৪৯) পুলিশের হাতে বেশ্যাদের দুর্গতির খবর দিচ্ছে--- "...নগর মধ্যে যে সকল বেশ্যারা বসতি করে তাহারাও রাজার প্রজা, চৌকিদারেরা তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া থানাতে ইন্সপেক্টরদিগেরহস্তে দেয় কিনা, এবং ইন্সপেক্টরেরা সমস্ত রাত্রি রাখিয়া তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করে কিনা বেশ্যাদিগের মুখে ইহাও জানা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন ইন্সপেক্টরদিগের মধ্যে অনেকে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যালয়ে যাইয়া কতস্থলে কত অত্যাচার করিয়াছে বেশ্যারাই তাহা ব্যক্ত করিবে..." (কলিকাতা সেকালের ও একালের / হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)

তখন একথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, সেকালে কলকাতার বাবুদিগের চারিত্রিক শৈথিল্যের জন্য বাইজী বারাঙ্গনাদের রমরমাহয়েছিল। বাজারে ভাল চাহিদা আছে দেখে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে নানা সম্প্রদায়ের মহিলারা এই নগরে এসে ভীড় করতে লাগল।মুসলমান নবাবীর উত্থান, সব মিলে তখন কলিকাতায় রূপ ও রূপেোর বেজায় সম্মান। ঘরের স্ত্রীকে অন্দরে সাজিয়ে রেখে বাবু কেষ্ট সেজে সন্ধ্যায় চললেন বারাঙ্গনা বাড়িতে। রাত্রে বেশ্যালয়ে থাকা সমাজে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য হত। কেউ কেউ আবার যবনী রক্ষিতা রেখেও নাম কিনেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতারএসরাজ, বাঁশী প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি হাফ - আখড়াই পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া আসিত।" এই সমাজ তাদের কখনো খাটো করে দেখেনি। ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত বাগবাজারের ভুবনমোহন নিয়োগী সরস্বতী পূজায় বিসর্জনের সময় চিৎপুরের বারাঙ্গনাদের মধ্যে এক হাজার জোড়া বেনারসী শাড়ী বিতরণ করেছিলেন।

এই নারীরা স্থায়ীভাবে অনেকে যেমন কলিকাতায় থাকতো, তেমনি একদল উৎসব পরবে এসে দিনকতক কাটিয়ে টু-পাইস কামিয়ে আস্তানায় ফিরে যেতো। ফ্যানি পার্কস কালীঘাটের গাজন উৎসব দেখতে গিয়ে কেরাঞ্চীগাড়ি ভাড়া করে আসা অনেক বেশ্যাকেদেখতে পেয়েছিলেন।

সেকালে যে শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু রমণীরাই অবস্থা বিপাকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করত এমন নয়, দেখা গেছে অভিজাত বংশীয়াখোদ ইংল্যাণ্ড দুহিতাও ভারতবর্ষে এসে পতিতার জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। উইলিয়াম হিকির মেমোয়ার্সে পাওয়াযাচ্ছে এমন এক বিলিতি বারাঙ্গনার কাহিনী। শ্রীমতি ডনডাস্ সদবংশের কন্যা হলেও কম বয়সে এক অশ্বারোহী অফিসারের প্রেমে পড়ে গৃহত্যাগ করে মাদ্রাজে পৌঁছায়। কিন্তু এক যুদ্ধে তার স্বামী প্রাণ হারালে ক্রমে কলিকাতা এসে জনৈক মিডলটন সাহেবের বাড়ির একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে দেহকে পুঁজি করে নতুন দেশে জীবন চালাতে লাগল। কিন্তু মিডলটন দম্পতির অত্যাচারে অবলা রমনী আত্মরক্ষার জন্য তৎকালীন সুপ্রীমকোর্টের বিচারক জাস্টিস হাইডের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেল। তাঁর দুঁখের সব কাহিনী শুনে হাইড সাহেব মহিলাকে সে রাত্রে মতো একটি ভদ্র ট্যাভার্নে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, (দ্র, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত/ ১ম খণ্ড, বিনয় ঘোষ/ পৃ. ১২৫

এই বেশ্যাদের কথা বাদ দিলেও সম্ভ্রান্ত সমাজে বেশ মর্যাদা পেত নাচগানে পটু বাইজীরা। ধনী উচ্চবিত্ত পরিবারে এদের সমাদর ছিল খুব। ১৮৩২ সালেই রূপলাল মল্লিকের পুত্র প্রাণকৃষ্ণের বিয়েতে 'উত্তমা নর্ত্তকীদের নাচগান হয়েছিল বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ১৮২৯ সালে গোপীমোহন দেবের বাড়ির দুর্গোৎসবে বাইজীদের নৃত্যগীতের আনন্দ নিতে লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্ক, লর্ড ক্যাম্বারমিয়ারও উপস্থিত ছিলেন। 'উত্তম' এই সব বাইজীদের মধ্যে বেগমজান, হিঙ্গনবাই, নান্নিজান, সুপলজান, নিকী, হীরাবুলবুল ও শ্রীজানের নাম এখনও লোকে মনে রেখেছে। দেখা গেছে, সেকালের বাইজীরা বিশেষ সামাজিক সুবিধা ভোগ করতেন। শহরের থেকে তাদের পেশা চালিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের কোন কর দিতে হত না। এমন এক তথ্যে পাই--- /১৮০৫, ত্ত্বত্তস্তড় গুন্তজপ্তব্দত্রজন্দ্ব ন্দ্বপ্রন্দ্বপ্পন্সাব্ধন্দস্তু ন্দ্রক্তপ্সপ্পত্রপ্তপ্ত ব্ধপ্রন্দ্বব্দ, ব্ধড়প্সত্তন্ধড় ব্ধড়ন্দ্বত্ত স্কদ্ৰম্ভত্র স্নন্তস্তু প্সন্দ্র্ প্সপ্তত্তব্ধজন্ত প্সুন্দ্ব প্লপ্সন্দ্বড়প্তন্ত ব্ধপ্সত্র ন্দ্বপ্রন্তড়ন্দ্বশুত্তন্দ্বজস্থ* ছচক্তপ্সত্তন্ধড়ব্ধপ্স, স্নন্দ্বব্ধব্ধন্দ্বজ ন্দ্রক্তপ্সপ্পত্র ত্ত্বজড়্জব্ধব্ধ ট্রপ্পন্স-১৮৯২গ্ন.

নিকীকে নিয়ে সেকালে বড়লোকদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হতো। মাসে হাজার টাকা দক্ষিণায় এক বড়লোক তাকে রক্ষিতা রেখেছিলেন। ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগান বাড়িতেও নিকীবাইজী নৃত্য পরিবেশেন করেছিল। ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাই---" 1823 May The Other evening we went to a party given by Ram Mohan Roy, A rich Bengalee Baboo, the Grounds, which are extensive, were all illuminated, and excellent fireworks displayed." তা হলেও একদল সাহেব আবার এই বাইজীনাচের প্রশংসা করতে পারেন নি। তাদের মনে হত, "The Nauch Women are, as usual ugly; huddle up in huge bundles of red petticoats and their exhibition as dull and insipid to a European taste, as could well be conceived."

।। চোর - ছ্যারোড় ।।

নগরপত্তনের প্রথমেই শুধু নানা ধরনের লোকের আনাগোনা। এখানে হাওয়ায় টাকা ওড়ে। ধূলামুঠি সোনা হয়ে যায়। সেকালে লোক গান বেধেঁছিল, "ক্ষুধা মেটাতে বিহারে মানভূম গেলাম, / চাকরী পেলাম না ছুটে কলকাতা এলাম।" (হাজার মজার কলকাতা / রামদাস লোহার)। শুধু কর্মের সন্ধানী, ফড়ে, দালাল, গণিকা, আর ভিখারী কেন, শহর কলিকাতায় সবাই এসে ভীড় করে বসল।চোর-বাঁটপার, দস্যু-তস্কর সকলেরই অবাধ আয়ের ব্যবস্থা এখানে। এর ফলে তখন ছিঁচকে চোরের উপদ্রবও খুব বেড়ে গিয়েছিল, জনৈক পাঠক এক চিঠি লিখেও পত্রিকা সম্পাদককে তা জানাচ্ছেন। "...কোম্পানি বাহাদুরের নিকট এই রাজ্য চোরেরা পত্তনি লইয়াছে ইহাদিগের করাদায়ে প্রজার ঢেঁকি কাঁথা কুলা - ধুচনী পর্যন্ত থাকে না ঝাঁটিয়া লইয়া যায় আমরা এ রাজ্যে বসবাস করিতে সমর্থ হই এমত সম্ভাবনা প্রায় রহিত হইল এই বর্ষমধ্যে ২/৩ বার করিয়া প্রত্যেক বাটিতে চুরি হইয়াছে।" চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে 'কস্যচিৎকলিকাতা নগরবাসিন' এক পত্রে সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশককে লেখেন, "...যাহারা মুষ্টিভিক্ষা করিয়া কালযাপন করে তাহাদিগের সম্বন্ধেও এতন্নগরে বাস সম্ভব না"। অর্থাৎ পত্রলেখক এই ভিক্ষুকদের প্রকৃত বৃত্তি সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে দিনে ভিক্ষাবৃত্তি করলেও রাতের এরা চৌরকর্মে লিপ্ত হয়। "তাহার মধ্যে দৃষ্ট হইবেক কতকগুলি শরীরপুষ্টি ভিক্ষুক আছে তাহারা দিবাভাগে নৃত্যকীর্তন করিয়া লোকরঞ্জন করে কিন্তু রাত্রিতে কোথায় থাকে তাহার নির্ণয় নাই"। পত্রলেখকের ইঙ্গিত হল যে এরাও রাত্রে চুরি করে বলে

'শরীর পুষ্ট' রাখতে পারে।

শহরে চুরি ছ্যাচড়ামি বেড়ে যেতে থাকলে ক্রমশ শান্তিরক্ষার উপর জোর দেওয়া শু হল। কোম্পানীর শাসকেরাও এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিল। ১৭০৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার পুলিশি ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। জন কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়ামে এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ১ জন প্রধান পিওন, ৪৫ জন পিওন, ২ জন চোপদার এবং ২০ জনগুয়লি (গোয়ালা) কে বেতন দিয়ে পুলিশে বহাল করল। (কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত/ বিনয় ঘোষ/ ২য় খণ্ড)। Fort William - এর Consultations গুলিতে এবিষয়ে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । ১৩৮ নং Consultation -এ পাই "দেশীয় অধিবাসীদের অংশে চুরি ডাকাতির বড়ই বৃদ্ধি হইয়াচে, এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এজন্য শহরের শান্তিরক্ষার্থে একজন ইংরাজ করপোরাল ও ছয়জন গোরা - সৈন্য থানার কোতোয়ালের সাহ য্যার্থে প্রেরিত হইল।"

কিছু দিনের মধ্যে তারা বেশ কিছু দেশীয় চোর - ডাকাত ধরে ফেলেছে। থানায় তাদের অহেতুক আটকে রাখার বদলে তাদের গালে লোহা পুড়িয়ে দাগ দিয়ে নদীর অপরতীরে পাঠিয়ে দেওয়া স্থির হল (Consultation- ১৭৫) কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় চুরি ডাকাতির শাস্তির জন্য আরও বেশী করে দেশীয় প াইক নিযুক্ত করার (Consultation – 188)

এদের চুরির ধরন দেখলেও তারা যে হতভাগ্য চোর তা বেশ বোঝা যায়, চৌর্যদ্রব্যের বহর দেখে। এক ছিঁচকে চোর 'একখানি মশারি ও একটি পাখির খাঁচা' চুরি করার জন্য 'জোড়াসাঁকো গ্রামে পোলীসের ম্যাজিস্ট্রেট পদে নব নিযুক্ত, মান্টিয়ন সাহেব' চোরকে থানায় 'লইয়া গিয়া বিংশতি বেত্রাঘাত করা কর্তব্য', মনে করে সেই দণ্ডই দিলেন। (সমাচার চন্দ্রিকা ২৮-৮-১৮৪৩)। আবার জনৈকসাহেবের ঘড়ি চুরির অপরাধে ব্রজমোহন দত্ত নামের এক ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হল। লালবাজ ারের চৌরাস্তার মোড়ে ঐভাবেই তাকেফাঁসি দেওয়া হয়। আসামী উপস্থিত জনতাকে সেলাম জানিয়ে 'সাহেব, তৈয়ার' বলে শেষ মুহূর্তের জন্য তৈরী হয়ে গেল। অ াবার সিঁদকেটে চুরি করার অপরাধে ১লা আগস্ট ১৭৯৫ সালে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ৬ জন লোককে প্রাণদণ্ড দেয়; ১৮ আগস্ট ক'জন ছিঁচকে চোরের হাত পুড়িয়ে দেয়, সামান্য কিছু রূপার গহনা চুরির অপরাধে লোচনকে প্রকাশ্যে চাবুক মারার পরে তাকে তিনবার House of Correction -এ বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

ছোটখাট চুরিতে হাত পাকিয়ে চোরেরা একটু বড়রকমের ঝুঁকি নিতেও তৈরি হতে লাগল। বাগবাজারের রাস্তার উপরের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর গায়ের অলঙ্কারের সাথে মন্দিরের ৫/৭ হাজার টাকাও চুরি হল। পরে থানায় খবর দিলে অনুসন্ধানে দেখা গেল জনৈক বেশ্যার বাড়িতে যাতায়াতকারী কর্মকার সম্প্রদায়ের একজন লোক ঐ টাকা ও অলঙ্কার চুরি করে তার বাড়িতে রেখেছিল। কিন্তু কর্মকার পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। (সমাচার দর্পণ; ১১/১২/১৮১৯)

আস্তে আস্তে চোরেরা চতুর হয়ে উঠল। রাতে সিঁদ কাটার চেয়ে দিনেই হাতসাফাইয়ের দিকে মন দিল তারা। পামার কোম্পানীর মদের গুদাম থেকে প্রকাশ্য দিবালে াকে তালা খুলে দুই পিপা 'পেদেরা সরাপ' বের করে মুটে ডেকে তাদের মাথায় চাপিয়ে ধীরেসুস্থে যাচ্ছিল দুজন চোর। তাদের এই আশ্চর্য কৌশল প্রথম লোকেরা বুঝতেই পারেনি। পরে সবাই বুঝতে পেরে চোরদের ধরে ফেলল। (সমাচার দর্পণ; ০৬/০৫/১৮২০) এই সব চুরিতে শিশুরা বেশ হাত পাকিয়ে ছিল তা জানা য াচ্ছে সমাচার দর্পণের ১৩/১২/১৮২০-এর খবরে। বড়বাজারের কাছে পাঁচ সাতজন অল্পবয়সী বালক খেলা করছিল সেইসময় এক মেমসাহেব পালকী থেকে নেমে বাজারে ঢোকার সময় বালকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করার ফাঁকে অপেক্ষাকৃত ছোট বালকটি ঐ মহিলার কাছে গিয়ে লুকালো। তিনি অবস্থা বুঝে বা কিছেলেদের পুলিশের ভয় দেখালে তারা পালিয়ে গেল। "অনন্তর ঐ জুয়াচোর বালক আপনার কোমার হইতে কঁইচী লইয়া ঐ বিবির কাপরের যে টাকার থৈলে ছিল তাহা কাটিয়া বেবাক টাকা লইয়া বিবিকে কহিলে যে তাহারা কোথা গেল যদি তাহারা আমাকে দেখে তবে আমারে পুনর্ব্বার মারিবে। বিবি কহিল যে তাহাতরা এখান হইতে গিয়াছে তুমি অন্য পথে যাও। পরে ঐ ধুর্ত্ত ালক ঐ ছল করিয়া টাকা লইয়া পলাইয়া। অনন্তর বিবি জিনিস খরিদ করিয়া টাকার দিবার সময় আপন জেবে হাত দিয় দেখিল যে টাকা নাই এবং আপন জেব কাটা। (সমাচার দর্পণ ; ১৬/১২/১৮২০)

আর এক সাহেবের পালকি থেকে দুইতিন হাজার টাকা ভর্তি নোটের বাক্স হাতিয়ে নিজের ঝুড়িতে রাখতে গিয়ে বেহারাদের হাতে ধরা পড়ল এক মজুর। এরা চুরির অছিলায় মজুর সেজে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকত বলেই মনে হয়। (সমাচার দর্পণ; ১২/১২/১৮১৮)

কিন্তু আবার কোম্পানীর লোকদের অন্য একটি ব্যাপারে মাথাব্যথা শু হলো। বিনা পুঁজির ইনকাম বলে এই পেশায় আবার সাহেবরাও হাত পাকাতে লাগল। অচিরেই বিলিতী চোরও দেখা গেল শহরে। সমকালীন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে খোদ বিলাতেই ছোটখাট চুরিছ্যাঁচড়ামির ঘটনা লেগে থাকত। সেই চোর বর্গের একাংশ কোম্পানীর চাকুরীতে এদেশে এলেও স্বভাব যায় না ম'লে।তাই দেখা গেল, "হ্যান্স ফোর্ট, পিটার হ্যারন্যালটন, সাইমন জন্যানসন ও ভান্ এক্ নামক চা রিজন সাহেব কলিকাতার মধ্যে অনেক চুরি করিয়াছে, চোরদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ও তাহাদের চোরাই মালের বখরা লইয়াছে।" তাই সিদ্ধান্ত হল যে এদের 'হ্য ারল্যাণ্ড' জাহাজে করে বিলেতে ফেরত পাঠানো হবে। এমনকি, জাহাজে তাদের খাদ্যবাবদ কোনও খরচও কোম্পানী দেবে না। জাহাজেই পরিশ্রমকরে নিজেদের খ াবারখরচ তারা জোগাড় করবে। (Consultation-286.)

সাহেবচোরের সমস্যা কিন্তু এত সহজে মেটে নি। এর পরেও সাহেবচোর নিয়ে কোম্পানীকে বিব্রত হতে হয়েছে। পুলিশ অফিস থেকে ১৭৯৫ সালে যে নোটিশ জ ারী হয়, তার মর্মার্থ হল, "গত দুইমাস কাল ধরিয়া এসপ্লানেড ও কেল্লায় যাইবার ও আসিবার পথে ও ময়দানে বড়ই রাহাজানি করিয়া থাকে তাহারও প্রমাণ প াওয়া গিয়াছে।" দেখা গেল যে ফোর্ট উইলিয়ামের কিছু ইংরেজ সৈন্যও এই অপকর্মে যুক্ত হয়েছিল। একালেও চুরি ছিনতাইয়ের দায়ে পুলিশের ধরা পড়ার খবর মাঝেমাঝে শোনা যাচ্ছে বৈ কি!

শুধু চুরি নয় সাহেবরা ক্রমশ ডাকাতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে। এই ডাকাতদলে প্রায় সত্তর জন সাহেব ডাকাত ছিল। এরা চীনাবাজারের ব্যবসায়ী চৈতনশীলের বা ড়িতে ডাকাতির ব্যাপারে ধরা পড়ে। জবানবন্দীতে জানা গেল যে এরা এক সময় হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কেওডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। যাই হোক, চৈতনশীলের বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য সো, বুফাস, জারান, ব্ল্যাঙ্ক, কোয়েল, ফ্যাসিনেভ ও মোহনপাল নামক একজন বাঙালীর ফাঁসি হয় ১৭৯৫ সালের আগস্ট মাসে। আবার কো ম্পানীর সিপাহীরা মেদিনীপুর থেকে খাজনার টাকা নিয়ে কলিকাতায় আসার পথে আর একটি সাহেব ডাকাতের দল উলুবেড়িয়ার কাছে সেই টাকা লুট করে। পরে বেশী সংখ্যায় সিপাহী নিয়ে সে টাকা উদ্ধার করে অনেক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল। কলিকাতার বাবু সাহেবরা তখন এই ভেবে স্বস্তিরনিশ্বাস ফেলেছিল যে এই ডাকাতদের 'একজনও ভদ্র ইংরাজ নহে' (২০-১১-১৭৯৪)। আর একবার ফোর্ট উইলিয়ামের তিন নম্বর সেনাদলের সৈনিক টমাস গিলবার্ট, টমাস হকিন্স ও দানিয়েল বেকার এসপ্লানেড অঞ্চলে রাহাজানির জন্য একত্তির হলেও পুলিশি সতর্কতায় সে অপকর্মে তারা সফল হয়নি। আগেই ধরা পড়ায় তাদের হাত পুড়িয়ে দু'বছর কঠোর পরিশ্রমের কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়েছিল।

এই সময় এক ব্যাঙ্কের নোট চুরি এবং মুদ্রা জাল করার বেশ কিছু খবর পাওয়া যায়। উন্নতমানের অপরাধের সাথে এদেশীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়রাও হাত মিলিয়েছিল। ইংরেজ বাদেও অন্যান্য ইউরোপীয়রাও হাজারো অপকর্মে যুক্তছিল। কলকাতা বসবাসকারী এক গ্রীক ব্যক্তিএক মহাজনের কাছ থেকে এক থলি মুক্ত া বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল। কিছু দিন পরে সে ঐ মুক্তা বিক্রি করে টাকা শোধ করার অঙ্গীকার করে মুক্তার থলিটি ফেরত নিয়ে মহাজনের কয়েকজন লোকের

সাথে মুক্তা বিক্রি করতে গেল। “ঐ ধূর্ত্ত গ্রীগলোক আপন বাটীতে গেল ও ঐ প্রকার এক থৈলী সিসার গুলিতে ও মটের পূর্ণ করিয় আপন ঘরে পূর্বের্ব রাখিয়াছিল পরে আসল মুক্তার থৈলী ঘরে রাখিয়া ঐ মিথ্যা মুক্তার থৈলী লইয়া চলিল। পথে গিয়া ঐ মহাজনের লোককে কহিল যে এই পারে বিক্রয় করিব না ওপারে গিয়া বিক্রয় করি। ইহা কহিয়া এক নৌকায় চড়িল ও কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ঐ মহাজনের লোককে কহিল যে তোমার মুনীবের আমাতে এত অবিশ্বাস যে এক জনকে আমার সহিত দিয়াছেন এইরূপ কথায় কথায় বিরোধেতে মিথ্যা রাগ প্রকাশ করিয়া ঐ মিথ্যা থৈলীজলে ফেলিয়া দিল।” (সমাচার দর্পণ; ৬-১-১৮২১)
চোর ধরার জন্য পার্ক স্ট্রীটের এক সাহেব পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন ১২ মে ১৮২১-র সমাচার দর্পণে। তার বাড়ির একটি সোনার ঘড়ি, একটি পাথর বসানো মোমের ও মিস ওয়াটস - এর নাম খোদিত একটি মোহর সহ একটি সোনার চেন চোরের কাছ থেকে যে উদ্ধার করে দিতে পারবে তাকে একশত টাকা বকশিশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন এই সাহেব।
চুরি ছাড়াও আরও কতগুলি ভয়াবহ ডাকাতির খবর পাচ্ছি এই সময়ে। এক খবর থেকে দেখা যাচ্ছে “গত শুক্রবার এগার ঘন্টা রাত্রি কালে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর নাচঘর হইতে পোর্ত্তুগীশ দুইজন সাহেব আপন ঘরে আসিতে ছিল শ্রী শ্রী জুতো বড় সাহেবের বাটীর দরবাজায় পূর্ববদিকে জনকয়েক গোরা ডাকাইত কৃত্তিম মুখ মুখে দিয়া সাহেবেরদের গাড়ীর নিকটে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে আমরা পুলিশের লোক। ...পরে বন্দুকের আঘাত মারিল তাহাতে সাহেব নিঃশক্তি পড়িল পরে সাহেবের জেব হইতে এক স্বর্ণ ঘড়ী লইয়া পলাইল। (সমাচার দর্পণ ৩/৩/১৮২১)
মদ্যশালা বরাবরই ছিল চোর - বদমাশদের আড্ডা। এ যুগের মতো সেকালেও এরা মদের দোকান ও ট্যাবার্নে জমায়েত হতো। ১৮০০ সালে জাস্টিস অফ পীস -রা গভর্ণর জেনারেলকে এক দীর্ঘ পত্রে এই সব বদমাশদের বিবরণ দিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে বলেন। এরা হল ডাকাত (Gang-robbers), নদীবক্ষের ডাকাত বোম্বেটে, গাঁটকাটা ও সাধারণ চোর, গচোর, প্রতারক ও পোদ্দারগণ, স্যাকরা, পর্তুগীজ, আর্মানী ওবাঙ্গালী নিলামওয়ালারা, এ দেশীয় পুরানো কাপড় বিক্রেতা, মজুর, খালাসি, মাঝি, বেহারা অন্যান্য শ্রেণীর চাকরবাকর। তাঁরা লিখেছিলেন, “….prevent these shops from continuing at present the rendezvous of thieves and robbers, vagabonds of all descriptions…”
এজন্য মদের দোকানগুলির উপর পুলিশের বিশেষ নজরদারী দিতে বলা হয়েছিল। (কলিকাতা / সেখালের ও একালের)
কলকাতা পুলিশের দেওয়া তথ্য থেকে সেসময়ের অপরাধের ধরন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

অপরাধ	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৫০	১৯৫১
মুদ্রাজাল	৩৩	৩৭	৪০	তথ্য নেই	তথ্য নেই
দাঙ্গা	২৫	২৪	১৫	তথ্য নেই	তথ্য নেই
হত্যা	১৮	২৯	১৭	৮৭	৩১
লুঠতরাজ	১৬	১৭	১১	৫৭	৫১
ডাকাতি	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	১০	০৮
ছিনতাই	৫০৪	৫১১	৪৩৩	১,৫৭৩	১,০৯২
চুরি	৪,১০৪	৪,৬৯১	৪,৭২২	৪,৬৫৪	৫,২০৪

(তথ্য Calcutta in the 20th Century; P/155)

একালের চুরি ডাকাতির কথা এতোই শোনা যাচ্ছে সে যে প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু কথা হল, বিলিতী আইনে চোর ডাকাতদের সাজা বড়ো কঠোর থাকা সত্ত্বেও কেন এই ধরনের অপরাধ এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল? কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র না কি ধনীদরিদ্রের আসমান - জমিন পার্থক্যই চৌর্যবৃত্তিতে প্রলুব্ধ করতো তাদের।
সে প্রসঙ্গে বাদ দিয়ে আপাতত বিলিতী আইনে এই অপরাধের জন্য নির্ধারিত সাজার ধরনটি দেখা যাক। মানুষ খুন অপেক্ষা চুরি ডাকাতি প্রতারণাকে অধিকতর গুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হতো বলে ইংরেজ শাসনের আদিপর্বে এইসব অপরাদের যে দণ্ডবিধান প্রচলিত ছিল তাতে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। দাস - দস্যু - সৈন্যসামন্ত -- কাউকেই দণ্ড বিধানকালে মানুষবলে গণ্য করা হত না। বুঝে উঠা সম্ভব নয় যে সে, দেশের লোকেরা কেন সাধারণ চোর - ডাকাতের উপর এতো ক্ষিপ্ত ছিল? সেই ফাঁদেপড়ে এদেশের হতভাগা ছিচঁকে চোরদের বেঘোরে প্রাণ হারাতে হচ্ছিল। দলিল জাল করার অপরাধে গোবিন্মরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্র ধরা পড়লে Quarter Sessions Court -এ বিলিতী আইন অনুসারে তার ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হয় ২৭-১২-১৭৬৬ তারিখে প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণর John Speneer ও তাঁর কাউন্সিলের কাছে পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত করে বলেন যে, দেশীয় অপরাধীর বিচার বিলিতী আইন অনুসারে হতে পারে না। এ দেশীয় বিধি অনুসারে রাধারচরণের ফাঁসির বদলে সামান্য আর্থিক জরিমানা হত। (কলিকাতা দর্পণ/ রাধারমণ নিত্র)একই অপরাধে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির কথা তো সবার জানা।
ট্রেভেলিয়ান তাঁর 'ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে সেদেশে এমন নির্মম একটি সাজার কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে একজন সৈন্যকে ষোল বছরের মধ্যে সংযমশিক্ষা দেবার জন্য ত্রিশ হাজার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। সমস্ত ১৭তশ এবং ১৮শ শতাব্দী জুড়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটির পর একটি প্রাণদণ্ডের আইন পাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত পায় দুইশতটি অপরাধের জন্যই প্রাণদণ্ড দেওয়া স্থির হল। /[illegible]
. এই লঘু পাপে গুদণ্ডের সাজা সমগ্র ইংরেজ সমাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতো। Parson Woodford তাঁর ডায়েরিতে এ ধরনের একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেমন ---“১৭৭২, ২২ জুলাই। বরার্ট বিগেন আলু চুরিকরেছিল বলে তাকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়েছিলৱ। একটি ঠেলা গাড়ির পিছনে বেঁধে তাকে চাবুক মারতে মারতে জর্জ-ইন থেকে এঞ্জেলপর্যন্ত, এবং সেখান থেকে আবার রাস্তার ুপর দিয়ে রয়াল-ওকের ভিতর দিয়ে জর্জ-ইন পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়েছিল।” ১৭৮১, ৭ এপ্রিল আবার লিখলেন, “আমার ভৃত্য ইউলকে আজ ছুটি দিতে হল। তিনজন দস্যুর ফাঁসি দেখার জন্য সে আজ নরউইচ পর্যন্ত দশ মাইল পথ হেঁটে যাবে ঠিক করেছে। ইউল ফিরে এল সন্ধ্যা সাতটার সময় এবং বলল যে তিনজনেই ফাঁসি যাবার সময় গভীর অনুতাপ প্রকাশ করেছিল।” (দ্র, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত / বিনয় ঘোষ / ২য় খণ্ড)

এই যদি হয় খোদ বিলাতের অবস্থা, তাহলে তাদের অধীনস্থ এই নেটিভদের দেশে তারা যে কিভাবে অত্যাচার করেছিল তা ব্যাখার প্রয়োজন নেই। কলিকাতার রাস্তার মোড়ে ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করে ডাকাতদের ফাঁসি ঝোলানোর আগে ঢেঁড়া পিটিয়ে লোকদের আহ্বান করা হত সে দৃশ্য দেখবার জন্য। ১০ জুন ১৮০৭ তারিখের রায়ে সুপ্রীম কোর্ট ছুরি মারার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়ার রায় দেয়। সেই রায়ের ভাষা হল to be executed on Saturday, the 13th , at the four roads which med at the head of Lall Bazar Street'.

১৮০০ সালের 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নালে' পাওয়া যায় এই ধরনের অনেক ঘটনার বিবরণ। অল্প বয়সী একটি চাকরকে হত্যা করার অপরাধে এদেশের একজন মহিলাকে প্রাণদণ্ডের সাজা দেওয়া হল। কলিকাতার এক চৌরাস্তার মোড়ে প্রকাশ্যে ফাঁসির মঞ্চতৈরী করে সাজা দেবার জন্য অনেক লোকের ভিড় জমে গেল। আসামী /ঞ্জ্রন্দ্ধ স্তুক্তজক্তন্সত্র ন্তুক্তন্ম প্সন্দ্র ভ্রব্ধন্দ্বক্ত,ত্রস্তুস্তুক্তন্দ্বব্দন্দ্বস্তুত্র ন্দ্রন্দ্বভ্র ভ্রপ্সক্তজস্তুব্দ ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ্ব প্সক্তপ্তব্ধন্দ্বব্ধক্তস্তুন্দ্বত্রস্তু প্সব্ধস্তুন্দ্বত্র ব্ধপ্তপ্সত্রব্দত্র ন্দ্রন্দ্ধত্রপ্তত্রস্তুনন্দ্বক্ত ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ্ব ভ্রপ্সক্তপ্তস্তু*.

সেকালের ক্যালকাটা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা ক্রনিকেল, ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল প্রভৃতি পত্রিকা ঘাঁটলে এ ধরনের অসংখ্য নারকীয় ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে। সামান্য অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া, চাবুক মারা, হাত পুড়িয়ে দেওয়ার মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতা ইংরেজ বিচারকেরা এই আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অনেক দেখিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, কানাই দে- কে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক থেকে একটি মোহর চুরির অপরাধে দশ দিন জেলের ঘানি ঘোরানোর পরে বড়বাজারের উত্তর থেকে দক্ষিণধার পর্যন্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাবুক মারা হয়; ডাকাতির অপরাধে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ১০ ডিসেম্বর ১৮০২ তারিখে বিজু মশালচির মৃত্যুদণ্ড হয়; চক্রান্তের দায়ে রামসুন্দর সরকারের সাত বছর দ্বীপান্তর, ইমাম বক্সের হয় যাবজ্জীবন কালাপানি।

১৮০৪ সালের পরে শাস্তির ধরনে কিছু পরিবর্তন এলেও প্রথম দিকে এই সাজা ছিল আরও নির্মম। ৫ এপ্রিল ১৭৫৯। কলিকাতার ইংরেজ জমিদাররা দণ্ডিত আশরফ ও মানিক দাসকে তিনমাস ধরে প্রতি শুক্রবার ১০১ ঘা করে বেতের ঘা দেবার রায় দিয়ে তা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল। চাবুক মেরে কোন অপরাধীকে মেরে ফেলেও ইংরেজ জমিদারদের মনে হতো সাজা তেমনকঠোর হচ্ছে না। তাঁরা তাই ১৭ নভেম্বর ১৭৬০ এক মিটিং করে স্থির করলেন যে দণ্ডিতকে কামানের মুখে বসিয়ে তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়াই উৎকৃষ্ট সাজা। এরাই এখন ইরাকের মানবাধিকার নিয়ে বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ছেন!

হঠাৎ দেখা গেল ১৮০৪ সালের পরে সুপ্রীম কোর্ট চুরির সাজায় কিছুটা নরম মনোভাব পোষণ করল। কিছু তাই বলে নরহত্যার জন্য কঠোর সাজার কথা তারা তখনো ভাবতে পারে নি। নির্মম দস্যুতস্করে সমাকীর্ণ তাদের প্রাচীন সমাজ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্যই হয়তো লঘুপাপে গুদণ্ড দেবার ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু ঐ বছর ৪ নভেম্বর খুনের অপরাধে জন ম্যাকলককিনের একটাকা জরিমানা ও একমাসের কারাদণ্ড হয়, খুনের জন্য জনৈক ম্যাথু ও মহম্মদেরও ঐ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ইউলিয়াম কেরী তাই মন্তব্য করেছেন। — 'varily the crimes of forgery and theft were considered by the legislators of those days more heinous than that of manslaughter'.

।। ফুটপাত চিৎপাত ।।

কলিকাতার আর একটি গুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হল ফুটপাতের বাসিন্দা। চরম দুর্গতি এদের জীবনে। কোন বিশেষ ধরনের কাজেই তাদের পারদর্শিতা নেই। যখন যে কাজ পায়, তাই করে। ফলে ধারাবাহিক কোন আয় সংস্থান নেই এদের। স্ত্রীলোকেরা তাদের বসতির নিকটবর্তী এলাকায় ঝি - গিরি করে, উৎসব পূজা বা কোন নেতার আগমন উপলক্ষ্যে প্রায়শ পুলিশ এসে এদের আস্থানা ভেঙে তাড়িয়ে দেয়। গবেষকরা দেখিয়েছেন, ফুটপাতবাসীদের মধ্যে যে কোন সংবাদ খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায় ; কোথাও কাজের সন্ধান, কোন জনহিতকারী সংস্থার রিলিফ, দরিদ্রনারায়াণ সেবা কিংবা তাদের ভাঙ্গার খবর খুব দ্রুত এদের মধ্যে ছড়ায়। ফ্যাক্টরি,, ডাক, রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী বলে এরা তার কাছাকাছি থাকা পছন্দ করে। কিন্তু কতো লোক যে এভাবে কলিকাতায় থাকে, সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কেউ বলেন দুই লক্ষ কেউ বলেন চার লক্ষ। কিন্তু বাস্তব ছবিটি কেমন, তা দেখা যাক--- ১৯৮৭ সালে CMDA লোক ধরে ধরে একটি সার্ভে করেছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে, কলিকাতায় ফুটপাতবাসীদের সংখ্যা৫৫,৫৭১ জন।

মাদার টেরেসার ভক্ত বৃন্দরা যাই বলুক না কেন, অন্যান্য অনেকগুলি সার্ভেতেও এই সংখ্যা ৫০ থেকে ৫৫ হাজারের বেশী বলে পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ সনের পরে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষে এদেশে প্রচুর লোক এসেছিল, তখনই এই সংখ্যা ৭০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদের অন্নসংস্থানের দিকটি নিয়েও কিছু কিছু গবেষণার হদিশ পাওয়া যায়। ১৯৭৫-এ CMDA -এর জেপুটি ডিরেক্টর ড. সুধেন্দু মুখার্জী ১০,৮৪১ জন ফুটপাতবাসীর পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছিলেন, এই ফুটপাতবাসীরা নানা পেশায় নিযুক্ত ও তারা রীতিমিত কাজকর্ম করেই জীবিকা নির্বাহ করে। . অ

অনিয়মিত দৈনিক মজুর ২৩.৪%
নিয়মিত দৈনিক মজুর ৮.৬%
রিক্সাচালক ৭.৩%
ঠেলাগাড়ীচালক ও মুটে ৬.৫%
সব্জী বিক্রেতা ৩.৬%
অন্যের বাড়ি কর্মরতা ৪.২%
হকার ৩.১%
কাগজ কুড়ানী ৪.৮%
ভিখারী ২২.০%
অন্যান্য ১৬.৫%

কাজেই ফুটপাতবাসী মানেই ভিখারী, বিদেশীদের সিদ্ধান্তের এইসব সমীকরণ বাস্তব তথ্যে প্রমাণিত হয় না। সরকারী এই সমীক্ষা বাদেও অন্য একটি সূত্র থেকে ১৯৭৮ সালে কলিকাতা বাড়িঘর লোকজনের যে হিসেব পাচ্ছি, তাতেও ভিখারীদের সংখ্যা ঐ একই দেখা যাচ্ছে---
বাড়ির সংখ্যা ৬,৩৫,২৫৭
লোক সংখ্যা ৩৩,০০,০০০ (৩২,০০০/বর্গ কিমি)

বস্তি ১,০১৫ টি (১,৫১৬ একর)
বস্তিবাসী ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ)
গৃহহীন রাস্তার বাসিন্দা ২,০০,০০০
বাইরের দৈনিক যাতায়াতকারী ১০,০০,০০০

এই সমীক্ষা অনুসারে বস্তিবাসীর টিজির হিসাব হল—
ছোটব্যবসা ১৫%
হাতের কাজ ২৩%
জন মজুরী ২৭%

বাস্তুহারা (পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত) মোট কলকাতাবাসীর ২৬% , তাদের টি জি

কেরাণী ৪০%
দোকান কর্মচারী ১৫%
দোকানী ও হকার ১৭%
কারখানার কর্মী ৯.৫%
পেশাদারী কাজ ৩%

এই হিসাব অনুসারে ফুটপাতের লোকসংখ্যা ২ লক্ষ, এরা গৃহহীন। থাকার জন্য কখনো কোন বাড়ি অফিসের দেওয়াল বা রাস্তার রেলিংকে অবলম্বন করে চট, ত্রিপল বা পলিথিন শিট দিয়ে অতি অপরিসর মাথা গোঁজার স্থান তৈরী করে। রাস্তার উপর ইট পেতে উনুন তৈরি করে রান্না, ঘরকন্না। রাস্তার কলের জলই সর্বং সহায়। বাচ্চার জন্ম মৃত্যু বেড়ে ওঠা সবই এই রাস্তাকে অবলম্বন করে। তাদের মূল ঠিকানা
বিহার, ইউ পি, ওড়িষা ২৮%
পশ্চিমবঙ্গের পাশের জেলাগুলি ৫০%
এদের টিজি
জঞ্জাল কুড়ানো ৫%
রিক্সা/ ঠেলা চালক ১৪%
ভিক্ষা বা পরজীবি ২২%
দিনমজুরী ২৩%

পলি পাল ১৯৭৪ সালে শিয়ালদহ রেল স্টেশন চত্বরে একটি সার্ভে করে দেখেছিলেন এখানে ৩০.০৪% নরনারী সেই লেভি জামানায় গ্রাম থেকে শহরে খ াদ্যশস্যের চোরাচালালেন সঙ্গে যুক্ত ছিল।
উপরোক্ত সুধেন্দু মুখার্জীর সার্ভেতে ৩৩,৭৪৩ জনের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখে গেছে যে এই কলিকাতায় ফুটপাতবাসীর ৯৮% ই গ্রাম থেকে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে শহরে এসেছে। এদের মধ্যে ৩২.২০% এসেছে ভিন্নরাজ্য থেকে, যাদের মধ্যে বিহারের অংশই বড়। প্রায় ২০% এসেছে বিহার থেকে, ৬.৬% বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু ফুটপাতে থেকে যে ফুটে যাওয়াও অতি সহজ, তা একালের স্টোনম্যানের অকারণ আক্রোশে হোক বা সলমান খানেরযৌবনের জলতরঙ্গের ধাক্কায় হোক, ব্যতিক্রম ছিল না সেকালেও। সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায় ৩-৮-১৮৩৪ তারিখের একটি সংবাদে পাই রাস্তায় শুয়ে থাকা একটি 'জবন কন্যা'র গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুর খবর। মায়েৰ কাছে সেই মেয়ে এমনভাবে ঘুমিয়েছিল যে মৃত্যুর এইখবর তার মাও সকালের আগে টের পায় নি। প্রতিবেদক লিখছেন, "...তাহার মাতা এমত নিদ্রিতা ছিল যে তাহার কোন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পরে প্রত্যুষে যখন গাত্রোত্থান করে তৎকালে ঐ কন্যাকে ২/৩ বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াও উঠাইতে পা রিল না, ইহাতেগাত্রস্পর্শ করিয়া দেখে যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে এবং মধ্যস্থানে গাড়ি গমনের চিহ্ন রহিয়াছে ও তৎপরিহিত বস্ত্র শয্যা রক্তে ভাসিতেছে... অ ামরা প্রায় সর্বত্র দেখিয়া থাকি গ্রীষ্মকাল হইতে ইতরলোকেরা রাস্তার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে...।" শুধু শয়নমাত্র নয়, বস্তির সংকীর্ণ গৃহে স্থানাভাব হওয়ার ফলে সমগ্র কলিকাতার বস্তিবাসীদের একটি অংশ পালা করে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে ও পরিবারের বাকী সদস্যরা তখন ঘুমায়। গরমের রাতে খাটিয়া মাদুর চাটাই পেতে রাস্তায় ঘুমানো শুধু কলিকাতায় নয়, সমগ্র উত্তরভারতের শহরগুলিতে অতি পরিচিত ছবি।
গাড়িচাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা সেকালেও খুব কম ঘটেনি। সমাচার চন্দ্রিকা জানাচ্ছে (মে ২৯, ১৮৪৩) "গত ১১ জ্যৈষ্ঠ বুধবাক রাত্রে নূতন চীনাবাজারের সম্মুখে একজন জবন মদিরাপানে মত্ত হইয়া রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিল এমতকালে একখানি চেরেট অতি দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার কালান্তক হইল অর্থাৎ উক্ত জবন তাহার চক্রে পড়িয়া দেহত্যাগ করিয়াছে।" এমনি আরও একটি মৃত্যুর সংবাদ পাই সমাচদর দর্পণে, কোন এক ভাগ্যবান লোকের গাড়ী চালাচ্ছিল একজন গে ারা সাহেব, জোড়াসাঁকোতে সেই গাড়ীর চাকায় এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মাথা সম্পূর্ণ গুড়িয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে(৭/১১/১৮১৮)।
কিন্তু এরা মারা গেলেও ঐ বছর ১৩ই ভাদ্র সকালে শোভাবাজার বটতলার কাছে একখানা পালকিগাড়ির চাকার নীচে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক চাপা পড়লেও সৌভ াগ্য ক্রমে সে বেঁচে যায়। তেমনি পালকি আরোহিনী একটি পুত্র সহ এক বিবি ৯ই আগস্ট রাতের কসাইটোলার চৌরাস্তার উপর দুই ঘোড়ার চেরিয়ট গাড়ির ধাক্কায় পড়ে গেলেও মাতাপুত্র কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে গেল (সমাচার চন্দ্রিকা; ৩১-৮-১৮৪৩)। পরে আরও দেখি গ্রাম থেকে শাকসব্জি বেচতে এসে রাজা রামচাঁদের বাড়ির কাছে এক সাহেবের পালকি গাড়ির ধাক্কায় একজন কৃষক আহত হয়েছিল (ঐ, ২১-৯-১৮৪৩)। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই সব খবরগুলিই ১৮৪৩ সালের কয়েক মাসের মধ্যে ঘটেছিল। তদানীন্তন কলিকাতার জনসংখ্যা ও গাড়িঘোড়ার হিসাব ধরলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কি খুব কম বলা চলে?

।। ভিখারী ফুকারী কয় ।।

বিদেশীরা এ শহরের যতো নিন্দা করেছে তার অন্যতম কারণ হলো ভিখারীদের চোখে পড়ার মতো উপস্থিতি আর তাদের বিকৃত কুৎসিত নাছোড়বান্দা স্বভাব। দেখা গেছে যে কলিকাতার ফুটপাতবাসীদের মধ্যে ভিখারীর সংখ্যা গড়ে ২২% এর মতো। কিন্তু এলাকা বিশেষে ফুটপাতবাসীদের মধ্যে ভিখারীর সংখা ৮% থেকে ২৫% এর মতো বলে দেখেছেন গবেষকেরা। ড. সুমিতা চৌধুরীর কালীঘাট অঞ্চলের ভিখারীদের নিয়ে সমীক্ষা ফলাফল প্রকাশিত হয় 'বেগারস্ অফ কালীঘাট, ক্যালকাটা' গ্রন্থে (ASOI, Cal-1987). তাতে দেখা গেছে যে কালিঘাট অঞ্চলের ভিখারীদের ৪০% -এর বয়স ১৫ বছরের নীচে। এদের মধ্যে পুষের চেয়ে নারীরর সংখ্যা বেশী। এদের ৫০% এসেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে, ২০% বিহার থেকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্য সহ প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আসা লোকের সংখ্যাও কম নয়।

বর্তমানের পেশাদার ভিখারীদের সংখ্যা যে কত তা নিয়ে অতি সম্প্রতি কোন সমীক্ষা হয়নি। তবে ১৯৮৭ সালে কলকাতার ফুটপাতবাসীদের সম্পর্কে CMDA -এ যে সার্ভে করেছিল তাতে মোট ফুটপাতবাসীদের ৮ শতাংশকে পেশাদার ভিখারী হিসাবে দেখানো হয়েছিল, বাকীরা সময় সুযোগ মতো ভিক্ষা করতো। CMDA-এর এই সার্ভে সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। কারণ সেখানেমোট ফুটপাতবাসী দেখানো হয়েছিল মাত্র ৫৫,৫৭১ জন। তাদের বিন্যাস ছিল---

পেশা	শতকরা হার	সাপ্তাহিক আয়	কাজের সময় (ঘন্টা)
কুলি	২০	৯৬	৮
ঠেলাচালক	১০	৯৮	৮
দেনিক মজুর	১০	৮৪	৭
রিক্সা চলক	১৩	৭৯	৮
হকার	৭	৭৫	৮
ড্রাইভার	১	১০৯	৯
গৃহভৃত্য	৩	৫০	৭
ভিখারী	৮	৩০	৬
চালকদের সহায়ক	৭	৮০	৯
কাগজ কুড়ানী	২	৬৭	৮
দোকান কর্মী	২	৬১	৯
ঝাড়ুদার	২	১১৪	৮
চা- ওয়ালা	২	৯৫	১০
সব্জি বিক্রেতা	৩	৮০	৮
অন্যান্য	১০	৮৭	৮

(তথ্য Economic and Political Weekly;4/6/1988)

বর্তমানে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভিখারীদের অবস্থান শুধু বিদেশীই নয়, দেশী লোকেদের কাছ্যে দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় তবে এই ভিখারীদের আয়পত্র খুব খারাপ, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কিছু দিন আগে টিটাগড়ের একজন মহানুভব ভিখারী জরাগ্রস্থ হয়ে পড়লে তার সারা জীবনের সঞ্চয় কোন দাতব্য প্রয়োজনে দান করার বাসনা প্রকাশ করলে সবার কৌতুহল হয়েছিল তার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারটির আয়তনের কথা ভেবে। সবার কৌতূহল নিবৃত্ত করে সে যখন সাত লক্ষ টাকা বের করে দিল, তখন সবাই বললেন, সাধু সাধু।

সেকালেও যে এদের আয়পত্র খুব খারাপ ছিল না। দুর্গাপূজার হৈ হুল্লোরের টাইমে কেজন ব্রাহ্মণ ভিখারী সেকালে দিনে ৮/১০ টি টাকা আয় করে ফেলতে পারত, সে খবর দিচ্ছে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা। ২-১০-১৯৪৩ তারিখে পত্রিকার সাংবাদিক লিখছেন, "একজন গরীব ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে আসিতেছিল তাহার প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম যে মাছুয়া বাজারের চৌমাথায় তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে তারার বিবরণ ঐই যে ঐ ব্যক্তি ভিক্ষোপজীবী ৮/১০টি টাকা ভিক্ষাদ্বারা উপার্জন করিয়াছিলেন পরে কোন দ্রব্য ক্রয় করণার্থে বড়বাজারে যাইতে হয় ইহাতে অপরাহ্নের প্রায় ৫ ঘন্টা সময়ে ঐ পথে উভয় দিগ হইতে দুইখানি গাড়ি আসিবাতে পল্লীগ্রামীণ ব্রাহ্মণ চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিয়া যেমন এক দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন সেইকালে তাহার সর্বস্ব একটি পুঁটুলি কোন সর্ববনাশিয়া আকর্ষণ করিয়া লইল তাহার কিছুই নিশ্চয় হইল না"। ভিখারীর পকেটমারের ঘটনা যে সেখালেও অজ্ঞাত ছিল না তা এখানে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বর্ণভেদের সমাজে বামুনভিখারীর যে আয়পত্র অন্যদের তুলনায় বেশ ভালই ছিল, তা এই ঘটনা প্রমাণ করে। শুধু ভাল আয় করেই তৃপ্তি নেই, ভিখারী হলেও তাদের ছিল ব্রাহ্মণসুলভ তীব্র অভিমান। এমনই এক অভিমানী ব্রাহ্মণের অকালমৃত্যুর খবর পাই এলিজা ফে-র ২৮-৮-১৭৮১ তারিখের চিঠিতে।

এই বামুন ভিক্ষুক এক অধঃস্তন বর্ণের জনৈক ধনী লোকের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে দানের বহরে খুব তৃপ্ত হতে না পেরে তার ব্রহ্মতেজ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ছোট জাতের এত স্পর্ধা যে ভিক্ষা দিতে গিয়ে অপর্যাপ্তদানে ব্রাহ্মণকে অপমান করা! গৃহকর্তাকে যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে সে তাঁর দরজায় টান টান শুয়ে পড়ল। তখন সবাই এসে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তুলে দেবার চেষ্টা করলেও সুবিচারের আশায় সে অনড় রইল। কিন্তু পরে ব্রাহ্মনের দাবীতে কেউ আর সদর্থক সাড়া না দেওয়ায় ৩৮ ঘন্টা নির্জলা ঐভাবে শুয়ে থাকার পরে তার প্রাণপাখিটি খাঁচা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল। অবশ্য এর পরিণতিতে আর কিছু হয়েছিল কিনা তার সংবাদ আর জানা যায় না।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই সব কিছুতে লাইসেন্সপ্রথা চালু করার উপর একটা ঝোঁক ছিল দেখতে পাই। সম্ভবত আয় বাড়ানোর উদ্দেশেই এটা করা হত। এমন কী, জনৈক রাম্মের সমরূৎ গোপাকে শ্রাদ্ধকর্মাদির জন্য লোককে বৃষ জোগানোর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল নির্ধারিত হয়ে ফি আদায়ের শর্তে। তাই বলে কি ভিখারীকেও লাইসেন্স দেওয়া হবে? লাইসেন্স দিয়েই যে ভিখারীর উপর নিয়ন্ত্রণ এনেছিল ব্রিটিশরাজ, সে খবরও পাওয়া যাচ্ছে--- To Nemoy Dass Birijoasee ষ্ণস্নন্দন্দভ্জ /দ্ধপ্সত্ত ত্রজন্দ ব্ধপ্স জন্দন্তন্দন্নন্দ প্সন্দ ন্তপ্সভ্রজন্দন্দ ম্নান্দভ্জ স্তুনন্দপ্নন্দ প্স নদ্ব্রন্তড় ব্দড়প্সম্ন ভ্রনব্ধড় ন ব্ধড়ন্দ বপ্সভ্রু ত্রস্তু ডডনব্দব্ধজনন্তব্ধব্দ প্সন্দ ট্রিপ্তন্তত্তব্ধব্ধব্রব্দত্রত্রপ্তপ্নব্দ ন্দ্রপ্সজ ব্ধড়ন্দ ত্ত্বন্ব্ধন্দ্রন্তন্দ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ ন্ধন্ধজব্দ.* স্নন্তন্দ্রুব্দন্দ, ডডব্ধ. ট্রিপ্তন্তত্তব্ধব্ধ, ৩১ব্দব্ধ গ্নত্তপ্তন্ত ১৭৬৫,*

(কলিকাতা / সেকালের ও একালের, ফুট নোট পৃ - ৩২৭)। হয়তো শহরের ভিখারীদের সংখ্যার হিসাব ও চুরিডাকাতিতে যোগ দেবার প্রতিবন্ধকতা হিসেবেই এই প্রথা চালু করা হয়েছিল সেকালে।

শহর কলিকাতায় ভিক্ষাবৃত্তির একটি বড় কারণ সংগঠিক ভাবে ভিক্ষাবৃত্তি পরিচালনা বা ভিকারী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিনাপুঁজির এই ব্যবসা পরিচালনা। সিণ্ডিকেটের কর্তারা নিজেরা ভিক্ষা করে না কিন্তু নিজেদের অধীনস্থ ভিক্ষুকদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ, নিজেদের ভিক্ষুকদের ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া, অন্য দলের এলাকাদখল থেকে বাঁচানো , আইন ও পুলিশি হুজ্জুতি থেকে রক্ষা করা এই ভিক্ষুক মাফিয়াদের কাজ। পুলিশের মতে অল্প বয়সী বালক বা লিকাদের চুরি করে বা কিনে নিয়ে এরা সম্পূর্ণরূপে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে এবং আমৃত্যু তাকে ব্যবহার করে চলে। অন্যদিকে বয়স্ক, অবহেলিত, গৃহ থেকে বিতাড়িতনারীপুষদেরও এরা দলে স্থান দেয়। তাদের আয়ের উপর এই মাফিয়াদের যে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তেমনি এদের অবাধ্য না হলে বয়সকালে তাদের রোগব্যাধির চিকিৎসা ও আশ্রয়দানেরও এরা খুব কার্পণ্য করে না। চৌরঙ্গী এলাকায় যেসব বিকলাঙ্গ ভিখারীদের দেখা যায় এরা সবাই এই সিণ্ডিকেটের নিয়ন্ত্রিত। তাদের লোক সকালে এদের খাইয়েদাইয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যায় আর দূর থেকে তাদের তাঁবেদাররা এদের আয়পত্রের উপর চোখ রাখে। শুত্রুবারে বিভিন্ন মসজিদের সামনে ও বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে গঙ্গার ধারে এদের বসিয়ে দেওয়া হয়। আমরা যুবনাশ্বের পটলডাঙ্গার পাঁচালী এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক দক্ষ পেশাদার ভিক্ষুকদের কথাশুনেছি। এদের নিয়ে গল্পগাছা বাংলায় অনেক লেখা হয়েও প্রকৃত গবেষণা হয়নি।

।। বৃহন্নলা সংবাদ ।।

কলিকাতার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যায় না হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য হিজড়েরা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। এদের প্রকৃত সংখ্যা কত তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কারণ তাদের অনেকেই নকল হিজড়ে। খৈরাতী লাল ভোলা পরিচালিত All India Hijra Kalyaina Sabha একটি সমীক্ষা করে দেখেছিল যে ১৯৮৪-১৯৮৬ সালের মধ্যে ভারতের জন্মগত শারীরিক ত্রুটির জন্য প্রকৃত হিজড়ের সংখ্যা ২১৩ মাত্র। (Survey Repor of All India Kalyana Sabha During 1984 T 1986 reveals that in all over India there are 213 children who are Hijra's ye Birth, The percentage of by birth Hijras is one out of one lakh children, ত্মন্দ্বন্দ্রজ্ঞ ন্ড্রুজ্জ্রব্ধন স্ত্রপ্ত চড়্স্পপ্ত্র গুন্দ্বব্ধব্ধন্দ্বজ্ঞ স্তুব্ধ. ১.৯.১৯৮৭গ্ন ফলে পথেঘাটে আমরা সব সময় যাদের দেখতে অভ্যস্ত তারা বেশীরভাগই নকল হিজড়ে।

দেখা গেছে, তাদের অধিকাংশই আর্থসামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণে স্বাভাবিক জীবন অগ্রাহ্য করে হিজড়ের দলে যোগ দেয়। গবেষকদের এইসব হিজড়েদের চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত আকুয়া অর্থাৎ মানসিক কারণে যে পুষরা নিজেদের মেয়ে বলে ভাবে এবং মেয়েদের পোষাক পরে মেয়ে সেজে থাকতে ভালবাসে। দ্বিতীয় বর্গে পড়ে জেনানা অর্থাৎ কোন মানসিক কারণ নয়, স্রেফ আর্থিক কারণের জন্যই যে পুষেরা হিজড়ের দলে যোগ দিয়ে সহজে আয়ের ফিকির খোঁজে। এরাই শারীরিক ক্ষমতার জন্য পরে দলপতি সেজে বসে। জন্মগত বা রোগব্যাধির কারণে এদের কারো কারো যৌনক্ষমতা না থাকলেও অনেকেরই নিজস্ব ঘর - সংসার থাকে। এরা সমাজের সহানুভূতির সুযোগে কম পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহের জন্য হিজড়ে দলে যোগ দেয়। ছিবড়ি অর্থাৎ সুস্থসবল যে মহিলারা অর্থনৈতিক কারণে হিজড়ের দলে যোগ দেয়, তারা পড়ে তৃতীয় দলে। এরা অনেকেই স্বামীসংসার পরিত্যক্ত; কেউ কেউ আবার এইপেশাকে আংশিক সময়ের জন্য ধরে রেখে চটজলদি কিছু কামিয়ে নেবার ধান্ধায় থাকে। হিজড়ে মহল্লায় দলপতির আশ্রিত হয়ে তার ফাইফরমাস খেটে সামান্য কিছু আয়পত্র করে নিজের দুস্থ পরিবার নির্বাহ করতে এই হীন পন্থা অবলম্বন। কিন্তু হিজড়েদের সাথে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তাদের আদবকায়দা রীতি - নিতি অনেকটা রপ্ত করে নেয় বলে তাদের পার্থক্য সহজে ধরা যায় না। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে ছিন্নি অর্থাৎ যে পুষদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় লিঙ্গছেদনের পরে হিজড়ের দলে অন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই গর্হিত কাজ ভারতীয় দণ্ডবিধীর ৩২৬ ধারা অনুসারে grievous hunt বলে চিহিত করা হয়েছে। এই কাজে যুত্ত থাকার জন্য ১৯৭৪ সালে কলকাতা পুলিশ ৪০ জন হিজড়েকে গ্রেপ্তার করে এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা যায় এদের ২০ জনকে বলপূর্বক হিজড়ে বানানো হয়েছিল (Mukherjee – 1980)।

ইদানীং কোন কোন ডাক্তারের সহায়তায় অবৈধভাবে লোককে হিজড়ের দলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সাধারণত অত্যন্ত কষ্টকর আদিম পদ্ধতিতে হাতপা বেঁধে পুষটির লিঙ্গচ্ছেদ করা হয়। সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেকেই সেই 'অপারেশন পর্বে' লোক মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে সেই ছিন্নিরা লিণ্ডিওল নামের হন্মনিবোধক বড়ি খেয়ে স্তনের আকার আকার বেড়িয়ে নেয়। লিণ্ডিওলে Ethiry Oestradiol বেশী থাকায় শরীরে এস্ট্রোজেনের (Oestrogen) পরিমান বেড়ে যায়। এই হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থিতে স্নেহদ্রব্য সঞ্চিত হয় , স্তনবৃন্ত স্ফীত হয়ে নারীসুলভ আকার দারন করে। সাধারণত দলপতিরা নিজেদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য সুস্থ মানুষকে এভাবে হিজড়ের দলে ভিড়িয়ে নেয়।

হিজড়ের দলপতিকে এরা গুমা বলে। কিন্তু অধিকাংশ নামে গুমা হলেও স্বভাবে এক এক জন মাফিয়া ডন বা নিজের এলাকায় হিজড়ে সম্রাট। তারই তত্ত্বাধানে সব হিজড়েদের প্রশিক্ষণ চলে, তার আশ্রয়েই থাকে তার দলভুক্তরা। ভারতের সব বড় শহরেই হিজড়েদের নিজস্ব মহল্লা আছে। কলকাতার খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, ওয়াটগঞ্জ, মেছুয়া, চেতলা, কলাবাগান, পার্কসার্কাস, কালীঘাট, মাণিকতলা ও রাজাবাজার এলাকায় হিজড়েদের অনেকগুলি আস্তানা রয়েছে। এছাড়া কোলকাতার আশেপাশে ক্যানিং ও ঘুটিয়ারি শরীফে রয়েছে হিজড়েদের দুটি বড় মহল্লা। এখন আবার মল্লিকপুরের কাছে গণিমা, গনেশপুর ও খোলাপোতায় হিজড়েদের নতুন বসতি শু হয়েছে। এরা ছাড়াও বনগাঁ, দক্ষিণ চবিবশ পরগণা, হাওড়া দিয়ে প্রতিদিন অনেক পার্টটাইম হিজড়ে কাজের জন্য শহরে আসে। কলকাতাকেই গবেষকরা হেদুয়া - শ্যামবাজারিয়া এবং হাওড়াইয়া এই দুইটি ঘরানার খোঁজ পেয়েছেন।

মানুষের দুর্বলতার সুযোগে হিজড়েগিরি এখন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দলের লোকদের খাটিয়ে তাদের শোষণ করে গুমায়েরা অনেক পয়সা করেছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। দিল্লীর আজমেড়ী গেটের কমলা হাজীর বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছিল এক কোটি আট লক্ষ টাকা (Hindustan Times)। অনেক হিজড়ে সদ্দারেরই রয়েছে দুতলা তিনতলা পাকা বাড়ি। এই পশ্চিমবঙ্গেই ১৯৯২ সালে ২৪ শে মে থেকে ৬ই জুন পর্যন্ত হিজড়েদের সর্বভারতীয় সম্মেলন বসেছিল হলদিয়া দুর্গাচকে। স্থানীয় বিধায়ক তাতে আবার সভাপতিত্ব করেছিলেন।

রাজনীতি এখন লাভজনক ব্যবসা বলে হিজরেরাও সে পেশায়ও পিছিয়ে থাকতে রাজী নয় মোটেই। অনেক দিন থেকেই তারা ভোটে অংশ নিতে শু করেছে। পাঞ্জাবের ভূচোমণ্ডী পুশভার নির্দল প্রার্থী সন্তোষ মহন্তা প্রথম হিজড়েরূপে পুরসভার ১৪নং ওর্য়া থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে বৈজয়ন্তীমালা মিশ্র নির্বাচনে অংশ নিলেও জয়ী হতে পারেনি (আজকাল - ৪/৫/১৯৯৬)। অনেক মামলা মোকদ্দমা করে ভোপালে একজন বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে বড়রকম সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছে।

এত গেল বাইরের কথা। আসলে হিজড়ের দল এতদিন নবজাতকের জন্ম উপলক্ষ্যে নাচগান করে মানুষের সহানুভূতি আদায় করে টাকাপয়সা নিয়ে বেঁচে থাকত। ইদানীং তা বেশ জোর - জবরদস্তিতে পরিণত হয়েছে। মোটা অঙ্কের টাকা না পেলে তারা এখনআর নবজাতকের বাড়ি ছাড়ে না। কিন্তু এভাবেও তাদের চলে না বলে একদল লেগে পড়েছে ডাক ও চোরাচালানের ব্যবসায়। নেপাল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে এদের আসল কাজকারবার চলে। তার সঙ্গে চুরিডাকাতি। কিডন্যা

পিং, খুন- জখমের সাথেও হিজড়েরা যুক্ত। ইদানীং ট্রেনের কামরায় উঠে যাত্রীদের হয়রানি করে পয়সা আদায় করার নতুন প্রবণতা যুক্ত হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগে কলকাতা পুলিশ একবার ২১ জন হিজড়েকে আটক করেছিল (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯/৩/১৯৯৫)। গবেষকরা দেখেছেন, । সুন্দরী তন্বীদেরও এস কাজে ভিড়িয়েছে গ্যাং লিডাররা। হিজিড়েদের আর একটি অবৈধ পেশা হল সুদর্শন তাকে ছিন্নি করে তার মাধ্যমে আয় অথবা অন্যত্র বিত্রি করে দেওয়া। এরা যৌনতাকেও পেশায় পরিণত করে সমকামীদের সঙ্গে দেবব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছে। শহরের নানা প্রান্তেই তাদের বর্ণময় উপস্থিতি নজরে পড়ার মাতো। এর ফলে এইডস সহ নানা যৌনরোগের প্রাদুর্ভাবও এদের মধ্যে বেড়েযাচ্ছে।

একথা তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হিজড়ের সংখ্যা ২,১০০ জন, তাদের মধ্যে কলিকাতাতেই রয়েছে ৩৪০ জন। (সর্বভারতীয় হিজড়ে কল্যাণ সভা ১৯৮৪-৮৬)। অন্য এক গবেষণার সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৩-৯৪ সালে কলিকাতায় হিজড়ে ছিল ৪৩১ জন। আর জেলাভিত্তিক তাদের সংখ্যা হল - হাওড়া ৩৯০, উঃ ২৪ পরগণা ৩৬০, দঃ ২৪ পরগণা ২৭০, নদীয়া ৯৮, বীরভূম ১০৫, হুগলী ২১৫, জলপুাইগুড়ি ৭৭, উঃ দিনাজপুর ৬৯, দার্জিলিং ৪৮, কোচবিহার ৯১, মালদহ ২১০জন। সব জল গড়িয়ে সমুদ্রে নামার মতো পালায় পার্বণে, পেশায় ধান্ধায় সব জায়গা থেকেই হিজড়েদের স্রোতও হয় কলিকাতামুখী।

।। নিম্নবর্গের মানুষেরা ।।

ওরে বিয়া করবো বলে আমি এনু এখানে।।
জেতে মুদ্দফরাস, কাশীমিত্রের ঘাটে বাস,
মড়া - পোড়া কাম করি খাট কাঁথা নিই টেনে। (রহস্যসঙ্গীত)

তিলজলা, ট্যাংরা, তপসিয়া, ধাপা অঞ্চলে এই শহরের চামড়াশোধনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হরিজন সম্প্রদায়ের প্রচুর লোক বাস করে। একাদিক নদর্মার দুর্গন্ধযুক্ত জলপরিবাহী খাল, আবর্জনার স্তূপ, শূকরের খোয়াড়, ধোঁয়া আর চামড়ার কারখানার কটুগন্ধের রাসায়নিক — এই দমবন্ধ পরিবেশে চামরা, মেহতর, কেহার, দোসাদ ও ডোমশ্রেণীর লোকেরা বাস করে। এক এলাকা বাদে অন্যত্রও এদের বসতি কম নয়।

গ্রামের অশিক্ষা, কুসংস্কারকে এরা শহরে নিয়ে এলেও অস্পৃশ্যতার দৈনন্দিন অভিশাপ শহরে নেই বলেই শহরের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকেও এরা সামাজিক মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। উদয়াস্ত নোংরা পরিবেশে এখানে ট্যানারির চামড়ার কাজের সাথে যুক্ত থাকলেও রাতে এরা দলবেঁধে ঢোলক বাজিয়ে সস্তার ধেনো সহযোগে গানবাজনা করে জীবনের গ্লানি কিছুটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। আবার এই সান্ধ্যআসরের জন্যই তাদের শ্রেণীগত সৌহার্দ্যও দৃঢ় হয়।

অনেক দিন ধরে শহরে থাকলেও এরা ওঝা, গুণীন, ভূতপ্রেত, হাতুড়ে ডাক্তারদের খপ্পর থেকে এখনও মুক্তি পায় নি। CMDA -এর সাহায্য সহানুভূতি যাই থাকুক না কেন, দেখা যাচ্ছে এদের ভাগ্যে তার কমই জুটেছে। আয়ের অনেকটা মদ্যপানে চলে যায় বলে দারিদ্র্য এদের চিরসঙ্গী, যদিও আয় অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী। ধাঙ্গড়, জমাদার, মেথর মুদ্দাফরাস শ্রেণীর লোকদের সরকারী ভাবে সাফাই কর্মচারী বলা হলেও তাদের জীবনযাত্রার মানের কোন পরিবর্তন হয়নি।

এরা বাদেও শহরে মুটে, ঠেলাচালক, রিক্সাচালক, হকার, ভিখারী, কাগজ-কুড়ানী, ঝাড়ুদার, রাজমিস্ত্রি, ছুতার, মুচিদের অবস্থাও তথৈবচ। দিন আনতে তাদের পান্তা ফুরোয়। তাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। ভগ্নস্বাস্থ্য, ঘনঘন ঘর্ভধারণ, প্রসবজনিত কারণে মৃত্যু ও অপুষ্টির কারণে তাদের গড় আয়ু খুবই কম।

নগরের আদিপর্বের ইতিহাস থেকেও নিম্নবর্গের মানুষের শ্রেণীচরিত্রভেদে যথাযথ উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। সেকালের অল্ড কোর্টহাউস স্ট্রীট ও কসাইটোলার সংযোগকারী রাস্তার নাম ছিল রাণীমুতি গলি। প্রাচীন ম্যাপে এর নানান বানানফের দেখা গেলেও এ গলির নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট ছিল। গলিটি মদের ভাণ্ডারে পূর্ণ। পাতি সাহেবরা ছাড়াও এদেশীয় সান্ধ্যরসিকজনের সমাবেশ ঘটত এখানে। এদেশী সমাজে পরিত্যক্ত মহিলারা এখানে মদ্য পরিবেশন করতো বলে মদ্য ও মহিলার সমাহারে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল অঞ্চলটি। ঐ অঞ্চলেই ছিল বেশ নাম করা গঙ্গামণি খানকির নিবাস। গঙ্গামণির প্রতাপে বাঘে ছাগে এখানে এসে এক ঘাটে জল খেতো। ‘প্রফুল্ল’ নাটকে এই গলির স্মৃতি বেশ জমকালো ভাবে পেশ করেছেন গিরিশ চন্দ্র ---

রাণী মুদিনীর গলি/ সরাপের দোকান খালি/ ... বাপের বেটী মুটির মেয়ে/ ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে/ নাচ গাও যত পার/ তার কি ঠিকানা/ মুটিনীর এমনি কেতা/ পড়ে থাক যেথা সেথা / জমাদার পাহারাদার/ নাইকো নিশানা।’

বর্তমান এজরা স্ট্রীটের সেকালের নাম ছিল ডোমটুলি। শহরের প্রথম থেকেই ডোমদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই শহরের ইতিহাসে। এই ডোমরা ১৭০৩ সাল থেকেই কোম্পানীর কর্মচারী হিসেবে মাসিক ছ'আনা হিসেবে মাইনে পেত। ১৭০৩ সালের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর হিসাবের খাতায় দুইজন ডোমের মাইনে দেওয়া হয়েছিল বারো আনা। অবশ্য তখন এদেরকে ডোম না বলেসাহেবরা লিখেছেন ‘হালালখোর’ (Hollocore)। এদের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে তখন বেশ সমস্যা ছিল। গ্লাসগোর ম্যাথিসন সাহেব তাঁর ‘ড্রঙ্কপ্তস্ত ব্ধপ্স ডডন্দ্বপ্তড়ন’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ঢব্ধ ভ্রপ্সত্তপ্তস্তত্রন্মান্দ্ধত্ত ব্ধড্রব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব প্পন্দ্ধন্দ্বব্দব্ধ প্সন্দ্রত্রপ্তপ্ত ব্ধড়ন্দ্ব প্সত্তন্তত্তস্দ্রব্ধনপ্স নব্দ ব্ধড্রব্ধ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্তনব্ধন্ত স্তত্তব্দব্ধপ্পন্দ্ধ ছন্ত চপ্সঞ্চস্ত ন্তপ্তপ্তন্দ্বস্ত ড্রপ্তপ্তন্তপ্সত্তন্দ্রদ্রস্ত ন্দ ট্রপ্তন্তত্তব্ধব্ধ ডডড়প্সপ্পন্দ্বব্দণ্ন্ত্র স্তন্দ্বব্ধন্ত্রস্তন্দ্বস্ত প্সত্তস্তন্দ্ব প্সন্দ্র ড্রন্ডস্তপ্সপ্সব্দস্থ.’ (কলিকাতা সেকালের ও একালের গ্রন্থের পুঠনোট, পৃ ২৯৫)। ১৭১১ সালের জুন মাসেও এই দুই কর্মীর মাসমাইনে হিসেবে ছ'আনা করে বারো আনা দেওয়া হয়েছিল।

বিখ্যাত লেবেদফ সাহেবের বেঙ্গলি থিয়েটার এর ঠিকানা ছিল ‘ত্বপ্স. ২৫ ডডপ্সপ্সপ্পব্ধত্তপ্তপ্তড়’. এই ডোমতুল্লাকেই একালের গবেষকেরা ডোমটুলি বলে মনে করেন (সাবেক কলিকাতার রাস্তায় ইতিহাস; ১ম খণ্ড, সমীর রায়চৌধুরী / পৃ.৪৫)। ১৯৮৪ সালের মার্ক উডের ম্যাপেও একে ডুমতুল্লাই হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। এ অঞ্চলে ডোমশ্রেণীর অন্ত্যজ মানুষেরাই বসবাস করত। গ্রামের সাধারণের ব্যবহার্য পুকুরের জল তাদের ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না, তাদের স্পর্শে অপবিত্র হত উচ্চবর্ণের মানুষ। তাই সুতানুটির একেবারে প্রান্তসীমায় তারা একত্রে বসবাস করত। মানুষের সৎকার ছাড়াও এরা বেতের ঝুড়ি ধামা তৈরী করত। পরে এ অঞ্চল ব্যবসাক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকলে ডোমেরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগল। আর ডোমটুলিও নিজের নাম খুইয়ে এজরা স্ট্রিটে পরিণত হয়ে ডোমদের স্মৃতি হরণ করে নিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের কলিকাতার নব্যবাবুদের মধ্যে যে ‘বাবু কলচরের’ সমৃদ্ধি ঘটেছিল, তার জোগান দিতে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের একটা প্রধান ভূমিকা ছিল। এই সময়ের খেউড়, পাঁচালী, খেমটা, কবিগানে কেষ্টা মুচি, গোঁজলা গুঁই, রঘুনাথ, লীলমণি পাটনী, নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রারা যে প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। বারোইয়ারি পূজার সময় কলিকাতায় ‘ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটি’র মুখুজ্যে কর্তাদের ছোটবাবুর অধ্যক্ষতকায় হাফ - আখড়াইয়ের যে আসরের বিবরণ হুতোম দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে মূলগায়ক বাদে দোহারদের অধিকাংশই "ঢাকাই কামার, চাষা, ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুন।" (উল্লেখ সরস্বতীর ইতর সন্তানঙতম সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)। নিম্নবর্গের মানুষদের এই প্রাধান্যের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে নগরায়ণের প্রাথমিক পর্বে অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন এখানে এসেছিলেন তেমনি শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে শ্রমজীবী সম্প্রদ

ায়ের কৈবর্ত, চাষী, ময়রা, জেলে, ধোপা, মালী, দরজী, কারিগর, নাপিত, জোলা, মুচি শ্রেণীর লোকেরাও পৈত্রিক পেশা ও ছোটখাটো ব্যবসা করার উদ্দেস্যে এখানে এসে জোটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, পূজাপার্বণ, আমোদ প্রমোদের উপায় উপকরণগুলি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

নব্যবাবুরাও এর মধ্যে দেদার মজার উপকরণ খুঁজে পেতে ত্রমে তাঁরাই এদের সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষক হয়ে গেলেন। কবি শিল্পী গায়করা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, অনুষ্ঠানের আয়োজকরা কিন্তু সব সমাজের পয়সাওয়ালা উপর তলায় লোক। কিন্তু পরবর্তী কালের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এগুলিকে সহজ মনে নিতে পারেন নি। 'বঙ্গদর্শন' যেন কতকটা ব্যঙ্গ করেই লিখেছিল, "জেলে, মালো, কুমার, কামার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ কথায় মিল করিতে পারিল, সেই মনে করিল আমি গীত গাইলাম... আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত। (কার্তিক, ১২৮০ সংখ্যা)। বঙ্কিম চন্দ্রের অনেক আগেই এই মানসিকতা বাঙালিদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। সমাচার দর্পণের ২৪সে এপ্রিল ১৮১৯ - এর একটি সংবাদে মহিলাদের চড়কে ঘোরা নিয়ে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছিল। সংবাদ এটি এরকম, "গত সংত্রান্তির দিনে মোং কলিকাতার একমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর কেজন স্ত্রী দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুড়িয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশহাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল"।

এমন নানা পেশার লোকেরাও যে শহরে আদি কাল থেকে এখানে ছিলেন তার প্রমাণ কলিকাতার জেলেপাড়া, কাঁসারিপাড়া, শাঁখারিটোলা, পটুয়াটোলা প্রভৃতি পল্লীর নামের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। যদিও এখন সেখানকার আদি বাসিন্দারা আর নেই। যেমন নেই ডোমটুলিতে ডোমেরা।

।। দুর্ভিক্ষের কবলে ।।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম থেকেই একটির পর একটি দুর্ভিক্ষে এদেশের লোকেরা অকালে প্রাণ হারাতে লাগল। তাঁদের নীতির জন্য এই দুর্ভিক্ষ হলেও তার দায় স্বীকারে তৈরী নন তাঁরা। তাই লেখক মুরহাউস গর্ব করে বলতে পারেন যে /[illegible]..* এসব বিজয়ীর মদগর্ব ছাড়া আর কিছু নয়!

১৭৭০-৭২ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে একলক্ষ লোক মারা যায়। হিকির গেজেটে পাওয়া যায়, ১৭৭০ -এর দুর্ভিক্ষে "no less than 76,000 souls in the town of Calcutta, between the 15th July and 10th September' বিনষ্ট হয়। মেকলে লেখেন, /[illegible] ১৫০০.* (প্রাচিন কলিকাতার দুই একটি চিত্র / কালীপ্রসন্ন দত্ত। প্রাচিন কলিকাতা গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

এর পর ১৭৮৩, ১৮৬৬,১৮৭৩,১৮৯২,১৮৯৭ সালে একের পর এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এদেশের লোক। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের ভাব হল ভয়াবহ।। তাতে বাংলার চল্লিশ লক্ষ লোক মারা যায়, প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশী। ১৯৪৩ এর দুভিক্ষের প্রকৃতচিত্র নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু মৃতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। একটি সংবাদে জানা যায়, ২৮ সেপ্টেম্বর ৩২৫ জন মৃতপ্রায় লোককে কলিকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তারা সবাই মারা যায়। ২৭ অক্টোবর তারিখে একটি বেসরকারী সংস্থা ১৭০ টি মৃতদেহ সৎকার করে। নভেম্বর মাসে সরকার ঘোষণা করল যে বাংলায় প্রতিদিন ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার লোককে লঙ্গরখানার খাবার দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য পরে কোথাও সমর্থিত হয়নি (Calcutta the City Revealed)। সমস্ত বাংলার ১/৩ ভাগ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন। সরকারী নীতির ফলেই যে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগের বছর যে ধানের দাম চৌদ্দ আনা মণ দরে বিত্রয় হত, তার দাম বেড়ে গেল কয়েক গুণ। পরের তিন মাসের মধ্যে কলিকাতায় চালের দাম তিনটাকা মরণ থেকে ৫/৬ টাকায় উঠে গেল। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষেরা কলিকাতায় এল সামান্য কিছু প্রাপ্তির আশায়। নানা সেবাপ্রতিষ্ঠান তখন সাহায্যের হাত বাড়ালেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। ফলে ১৩,০৪,৩২৩ জন লোক রাজপথেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করল (উডহেড কমিশনের রিপোর্ট)। বিয়াল্লিশের সেই মন্বন্তরের ছবি স্থায়ীছাপ ফেলে গেল মানুষের মনে "নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত একজীব,/ ঠিক মানুষের মত/ কিম্বা ঠিক নয়/ যেন তার ব্যাঙ্গচিত্র বিদ্রুপ বিকৃত।" সমগ্র কলিকাতা জুড়েই সেদিন শোনা গেছে, 'মানুষের সৎভাই চাই শুধু ফ্যান' (ফ্যান, প্রেমেন্দ্র মিত্র)।

।। মরছে বিনা চিকিচ্ছেয় ।।

১৭০৭ সালে কলিকাতা দুর্গের আশেপাশে একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য কোম্পানী ২০০০ টাকা মঞ্জুর করল (১৬ই অক্টোবর)। এই আদেশে ইউরোপীয় সমস্ত জাহাজের মালিক ও কলিকাতায় বসবাসকারী সব নাগরিকদেরও বাধ্যতামূলক চাঁদা দানের আদেশ দেওয়া হল। কোম্পানীর বক্‌শী মি. অ্যাডাম কে এই হাসপাতাল তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতার এই প্রথম হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান গার্স্টিন প্লেস এলাকায়। কিন্তু এই হাসপাতালটি যে খুব রোগনিবারক না হয়ে রোগী সংহারক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল তা ক্যাপ্টেন আলেক্সাণ্ডার হ্যামিল্টনের এই সরস মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে।

"The Company has a pretty good hospital at Calcutta where one may go into undergo the penance of physic, but few come out again to give account of its operation."

হাসপাতালের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, স্বাস্থ্যসচেতন সাহেবরা মনে করেন হাসপাতালের পরিবেশে যাতে শহর কলুষিত হতে না পারে, তার জন্য ১৭১০ সালে এটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল।

প্রাথমিক পর্বের কলিকাতায় এই ধরনের হাসপাতাল দু' একটা প্রতিষ্ঠিত হলেও তাতে হতভাগা নেটিভদের ঠাঁই মেলা মুস্কিল ছিল। সাহেব ডাক্তার মানে তো অনেক টাকা। এজন্য যেমন গ্রামে ওঝা-বৈদ্য, ঝাঁড়-ফুক, তন্ত্র - মন্ত্র, শীতলার থান, যীশুর কৃপা ভরসা করে লোকেরা বাঁচে, সেদিনও গরীবদের পক্ষে এর কোন ব্যতিত্রম ছিল না। সাধারণ মানুষের তো ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা নেই।। দেশীয় বৈদ্যদের অনেকেই আকাট মুর্খ, কিন্তু ভয়ানক শঠ ও লোভী। নানা ফিকিরে ডাক্তারদের রক্তচোষার আধুনিকদৃষ্টান্তগুলি কলিকাতা নগরীর জন্ম লগ্ন থেকেই শু হয়েছিল। ১৮২০ সালের সংবাদপত্রে পাওয়া যাচ্ছে "যে সকল জ্ঞানবান চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান। যে স কল কবিরাজ থলি হাতে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়, তাহারাই গরীব দুঃখীদিগকে দেখিতে আসে। কোন বৈদ্য রোগ নিরূপক করিলেন, কিন্তু ঔষধির ব্যবহার করিতে পারে না। কেহবা ঔষদি করিতে জানে, নাড়িজ্জ্ঞান নাই। কাহারো বা শাস্ত্রজ্ঞান নাই।...ইহারা কি প্রকার করিয়া লোক বাঁচাইতে পারে। তবে যে পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য। পীড়া ভাল হওনের কিছু নাই। যখন কবিরাজ হদ্দমুদ্দ চিকিৎসা করিয়া দেখিল যে রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই, তখন তিনি রোগীর আত্মীয় স্বজনকে পরামর্শ দিলেন যে ভাগ্যিস আমরা ছিলাম তাই রোগীর গঙ্গাযাত্রা করিবার সৌভাগ্য ঘটিল, তাহা না হইলে রোগী কখনও গঙ্গা পাইত না।" (কলিকাতা / অতুল সুর)

সমসাময়িক দস্তাবেজ থেকে যাচ্ছে, সেকালের কলিকাতা শহরে ওলাওঠা একটি মারণ - রোগ হিসেবেই কুখ্যাত ছিল। ১৭৬২ সালে প্রায় ৫০,০০০ বাঙালি এই রোগে মারা যায়। অবশ্য ধনীদরিদ্র কেউই এই রোগের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কাঁচা নর্দমা এবং দুষিত জলের পুকুরকেই এর জন্য দায়ী করা হয়েছে। উনবিংশ

শতাব্দী শেষ পর্বে যখন কলের জল ও মাটির তলায় ড্রেনের প্রচলকরা হল, তখন এই রোগের প্রকোপ খানিকটা কমে গেলেও ১৮২০-১৮২৫ সালের মধ্যে আবার এই রোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেকালেরকবি হাজারো রোগের বিবরণ দিয়ে পদ্য লিখেছিলেন "ওলাউঠা সংক্রামিকা / মহামারী বিসূচিকা/ আর কত ব্যাধি অগণন/ ... শূণ্য করে কোটা - ভিটা/ মহামারী ওলাউঠা/ নরনারী মরিতে লাগিল/ কলিকাতা খণ্ডগ্রাম/ জানিনা সকল নাম / হইল শ্মশানে পরিণত।" (ওলাইচণ্ডী মাহাত্ম্য/ আশুতোষ শী)।

এই কলেরার সঙ্গে ম্যালিরিয়া জুটেছিল আর একটি মারণব্যাধিরূপে। ১৮৭০ এর দশকে জ্বর ও কলেরায় শহরে মৃত্যুর যে চিত্রটি পাওয়া তা এককথায় ভয়াবহ।

সাল জ্বরে মৃত্যু কলেরায় মৃত্যু মৃত্যুর হার
১৮৭১ ৪,২৪২ ৭৯৬ ২৩.০
১৮৭২ ৪,৩৯৫ ১,১০২ ২৩.০
১৮৭৩ ৩,৬৩২ ১,১০৫ ২৩.০
১৮৭৪ তথ্য নেহ ১,২৪৫ ২৬.৮
১৮৭৫ তথ্য নেহ ১,৬৭৪ ৩২.৭
১৮৭৬ তথ্য নেহ ১,৮৫১ ৩০.১
১৮৭৭ ৪,৪৬১ ১,৪৬১ ৩১.৯
(তথ্য Calcutta: People And Empire / নিমাই সাধন বসু)

কলেরায় যে এ শুধু হতভাগার দলই মরেছিল তা নয়, সেকালের বিখ্যাত সব চরিত্ররা এই রোগের শিকার হয়েছিলেন। ১৮৪২ সালে ডেভিড হেয়ার যেমন ওল াওঠায় মারা যান তেমনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কীর্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহও মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ওলাওঠায় মারা যান। সমাচার দর্পণের সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে, "বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্জি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার এক্‌শ্চেঞ্জ দর্পন ২৯/৪/১৮২০) তাই বাধ্য হয়ে কর্পোরেশনের মেডকিল অফিসার পুকুর সাফ করানোর আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হয় নি। বর্তমান শতাব্দীতেও এই অবস্থায় বিশেষ বদল হয়নি, তা নীচের ছক থেকেই পরিস্কার হবে।

রোগের মৃত্যু ১৯০৯ - ১০ ১৯৫০
বসন্ত ৩,৭৮৪ ৯,৩৩২ ৯,৩৩২
অ্যাজমা ৩,৩৩৬ তথ্য নেই
প্লেগ ২,১১৭ তথ্য নেই
কলেরা ২,০২২ ৩,৮৮০
ম্যালেরিয়া ১,৩৯৩ ১,০৭৮
আমাশয ১,৩৭৭ ৫,৭০৬
টিটেনাস ১,০৩৬ ১,৪৪৪
টাইফয়েড -------- ১,৪৪৪
যক্ষা ১,৮৮৫ ৩,২৬৩
(তথ্য Calcutta in the 20th Century, p -200)

মহামারীরূপে প্লেগ মাঝে মাঝে কলিকাতাকে সন্ত্রস্ত করে তুলত। ১৮৯৬ সালে বোম্বে থেকে আগত মহামারী প্লেগ থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে মেডিকেল বোর্ড ২০০ জন কুলি ও ৬০ টি গর গাড়ীর একটি বিশেষ বাহিনী তৈরী করেছিল। রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে পরে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১,৫০০ এবং ৩২৯-এ দাঁড়াল। তখন ড. সি বলস্ শহরকে ১৭টি স্যানিটারী সার্কেলে ভাগ করে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করেন (কলিকাতা তারিখ অভিধান / দিব্যেন্দু সিংহ)। আবার ১৮৯৮ সালেও একব ার প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। তাতে এত বেশী সংখ্যাক লোক আক্রান্ত হয়েছিল যে হাসপাতালে তাদের ঠাঁই না হওয়ায় শহরের বড় বড় বাড়ির ছাদে হাসপ াতাল তৈরী করে দিতে হল। একবার রব উঠল যে রোগলক্ষণ পরীক্ষার জন সাহেব ডাক্তার এসে মহিলাদের কুঁচকি পরীক্ষা করবেন। অনাছিষ্টি সেই কথা শুনে দলে দলে লোক শহর খালি করে পালাতে লাগল। সুযোগ বুঝে গাড়োয়ানরা গাইনর ভাড়া দশ বিশ গুণ বাড়িয়ে দিল। (কলকাতা / অতুলসুর) ১৮৯৯ - ১৯০০ স ালে কলিকাতার ১,৩,৫,৬ ও ২২ নং ওয়ার্ডে ৭২০ জন লোকগ প্লেগে আক্রান্ত হলে ৬৬৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। (W. R. Bright Epidemic of Plague in Calcutta 1899 – 1900, P-2)

কলিকাতায় যে রোগব্যাধির কথা বলা হয়েছে। তাতে এদেশীয়র বিদেশীয় কেউই রেহাই পেত না। ১৬৮৯ সালে কলিকাতায় এক সংক্রামক জ্বরের খবর পাওয়া য ায় তাতে আগস্ট মাস থেকে পরবর্তী বছর জানুয়ারী মাসের মধ্যে শহরের অধিবাসী ১,২০০ জন ইংরেজের মধ্যে ৪৬০ জনই মারা যায়। এই জ্বর বিষয়ে একজন সৈনিক লিখেছিলেন, "What with hum of the mosquito aboves, and the bug in the bed below, I am regularly humbugged out of my night's rest." (তিন শতকের কলকাতা / নকুল চট্টোপাধ্যায়, মিত্র ঘোষ পা. প্রা. লি / দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৬, পৃ. - ১২। ১৭৬২, ১৭৬৮ এবং ১৭৭০সালে এই ধরনের জ্বর এবং আমাশয়ে আশি হাজার বাঙালী ও দেড় হাজার ইংরেজ মারা গিয়েছিল।

কোম্পানীর আমলে ওলাওঠা খুব ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল। সমাচার দর্পণের ২১শে নভেম্বর ১৮০০ সালের এক খবরে দেখা যায় যে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক দিনেই ৩৫ জন লোক মারা যায়। পরের দিন মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪০ হলে সংবাদদাতা আশঙ্কা করলেন যে এখন থেকে মৃত্যু বেড়েই যাবে। ১লা মে ১৮১৯ এর অন্য এক সংবাদে দেখি, শুধু কলিকাতা নয়, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ও শ্রীলঙ্কাতেও নতুন করে এই রোগের আক্রমনে অনেক সাহেব মারা যাচ্ছেন। কিন্তু পরের বছর রোগ একটু কমেছিল। তাহলেও ২০ মে ১৮২০ সালের এক সংবাদে পাই, মে মাসের ৬ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ওলাওঠায় ৯৬ জন হিন্দু এবং ২০ জন মুসলমান মারা য ায়। দৈনিকের হিসাবে ধর্মভিত্তিক মৃত্যুর এই তালিকা কৌতূহল জাগাতে পারে।

এই ওলাওঠার তীব্র প্রকোপে মানুষের মধ্যে অনেক গল্পগাছাও জন্ম নিয়েছিল। যেমন – লালবাজারের নতুন গির্জা ঘরের হাওয়ামোরগ যেদিকে মুখ করে থাকে,

সেইদিকে রোগের উপদ্রব বাড়ে এবং লোক মারা যায় । ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ সালে এক পত্র লেখক লিখলেন, "যে সকল বাঙ্গালিরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নতুন গির্জা ঘরের উপর যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ... আমার তিনজন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লাঘাটে গেল। সেখানে দেখিল যে মুরগ তাহাদের দিকে মুখ করিয়া আছে। তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া তথা হইতে পলাইয়া খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথা হইতে বৈঠকখানাতে পলাইয়া গেল। সেখানেও তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল পরে তিনজনের মধ্যে দুই জন দৌড়িয়া পলাইতে পারিল না লনা অতএব ওলাওঠা হইয়া সেখানেই মরিল। তৃতীয় জন যুবা ছিল। এই প্রযতুক্ত পলাইয়া রক্ষা পাইল।"
এখনও ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফেয়েড, বসন্ত, আন্ত্রিক, ডেঙ্গুতে দলে দলে লোক মারা যায়, তখন অসহায় বলে মনে হয় নগরে বাস করা।

।। কলিকাতার বারোমাস্যা ।।

কলিকাতার বিচিত্র জীবন, এর সুখ ঐশ্বর্যের সাথে এর দুঃখদারিদ্র্য, ঝলমলে আলোর নীচের অন্ধকার দিকটিই কবিলেখকদের আকৃষ্ট করেছে বরাবর। সেই প্রথম পর্বে কুলুই চন্দ্র সেন, ভবানীচরণ, হুতোম যেমন ছিলেন, পরে রঙ্গলাল - হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ এবং একালের সুনীল শরৎ শক্তি কেউই বাদ যাননি কলিকাতার নিন্দা- প্রশস্তি লিখতে। এক প্রবন্ধে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ডিহি কলিকাতার প্রসঙ্গ, "একশত বৎসর হইল কলিকাতার নগরী ভয়াবহ ব্যাঘ্রনত্রাদির বসতিস্থল ছিল। কিন্তু এক্ষণে কলিকাতায় নিয়ত ৫/৬ লক্ষ লোক বাস করিতেছে।" (কলিকাতা কল্পলতা) হেমচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় বিস্ময়কর ভাবে আমাদের আধুনিক কবিদের মতো নগরীর অন্ধকার দিকটিই ফুটে উঠেছে, "যার বাজার গলি বিষ্ঠেনলি বাইরে জুলে ঝাড়, / যার বুকের ওপর বেশ্যাপাড়া মেথর, হাঁকায় ষাঁড়।" এর সাথে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষাও যেন মিলে যাচ্ছে, "....গলি - খুঁজির ধারে / খড়ি - মাখা বেশ্যারা ফের কাষ্ঠহাসি হেসে থাকবে পেতে ওৎ / ছাত্র, মাতাল, মজুর, কুলির আশায়, / ভিক্ষা মেগে মেগে / ফিরবে আবার ঠক, জুয়াচোর , কানা, খোড়া, কুষ্ঠ রোগীর দল।" (বিরাম) রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে গলির কথাপাওয়া যায়, তাকে যে কোন বস্তির স পথের সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসে, "গলিটার কোণে কোণে / জমে ওঠে,পচে ওঠে/ আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি/ মাছের কাণকা, / মরা বিড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।" (কিনু গোয়ালার গলি)
কলিকাতার প্রায় একই রূপ বনফুলের চোখে পড়েছে সিনেমা দেখতে গিয়ে। সমস্ত ছবি জুড়েই তিনি দেখেন 'প্রেম খুন, গান, মদ, সিনারি ও বেশ্যার ঘন্টা/ স্যামলী ধবসী এল চকিতে ট্যাক্সি চড়ি গোষ্টে/ দুষ্ট কুষ্ঠব্যাধি - গলিতা/ নাচিছে শিল্প - কলা ললিতা।" (সন্ধ্যায়) শঙ্কর লিখেছেন 'জনারণ্য' আর বিষ্ণু দে বললেন, "জনস্রোতে ভেসে যার জীবন যৌবন ধনমান, / আশে আর পাশে, সামনে পিছনে/ সারি সারি পিঁপড়ের গান, / ...জীবিকার পথে পথে এত লোক,/ এত লোককে গোপন সঞ্চারী / জীবন যে পথে বসিয়েছে..." (টপ্পা ঠুংরি)। সমর সেন যেন অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন এই জনতার ভীড়কে; অহেতুক, অনাবশ্যকরূপে, "রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাস" (নাগরিক) জীবনানন্দ দাসের কবিতার ভাষাই কি টেরেসাভক্ত পশ্চিমী লেখকরা নিজেদের করে নিয়েছিলেন? "হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল" - এর চিত্রকল্পের বিষমিষা পাঠককে এখনও সমানভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে (নগরীর রাত্রি)। বিয়াল্লিশের সেই মন্বন্তরের ছবি স্থায়ী ছাপ ফেলে গেল মানুষের মনে "নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব,/ ঠিক মানুষের মত/ কিম্বা ঠিক নয় / যেন তার ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রুপ বিকৃত। " সমগ্র কলিকাতা জুড়েই সেদিন কাতর চীৎকার শোনা গেল "মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান" (ফ্যান, প্রেমেন্দ্র মিত্র) "জানি মানুষের শব মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর পর/ ক্ষুধিত অসাড় তুন." লিখেছিলেন ফরখ আহমদ।বস্তির দৈনন্দিন চিত্রও স্পষ্ট হয়ে যায় শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের 'বস্তিতে কোলাহল' কবিতায়, "বস্তিতে বেড়েছে কোলাহল/ হিংস্র নিষ্ঠুর আর অশ্লীল বাক্যের স্রোত/ দ্রুত উৎসারণে বিদ্বেষ হানে পরস্পরে।"
চার্নকের স্মৃতি নিয়ে সেই কবি ডইয়ার্ড কিপলিং সেই যে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ থাকলেও কলিকাতার সেই চরিত্র বদলায়নি আজকেও 'ত্নপ্তন্তন্দ্ব, ভ্তুজন্দ্ব, ড়স্প্লন্দ্বপ্ত- ত্নস্প্লন্দ্বজব্ধস্তুস্ত স্নাজনস্তন্দ্বঙ্গ ত্রনস্তন্দ্ব ভ্তু ব্দনস্তন্দ্ব.* কিন্তু আমাদের কবি ছিলেন আশাবাদী, তাই লিখতে পেরেছিলেন, "আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটিরে/ শেভিবে অমরাবতীরূপে করি গ্লানি/ রাজ - হর্ম্যে দৃঢ় দুর্গে, আলোকমালায়" (নবীনচন্দ্র সেন) --- হতভাগ্য বস্তি জীবনের যে আর এক আলেখ্য।

।। তথ্য সূত্র ।।

১. এই কলকাতা কবিতার, শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি; ১৯৯২
২. কলিকাতা শহরের ইতিকথা, ১-৩ খণ্ড, বিনয় ঘোষ, বাকসাহিত্য, ১৯৮১
৩. ঝুপড়ি বস্তি কোলকাতা, দেশ, ৫৬/৩১, জুন ৩,১৯৮৯
৪. কলিকাতা তারিখ অভিধান, দিব্যেন্দু সিংহ
৫. কলকাতা, অতুলসুর; জেনারেল প্রিন্টার্স এয়াণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি, দ্বিতীয় সং ১৯৮৪
৬. আমি আপনি কলকাতা; শিবপ্রসাদ সমাদ্দার; ভারতী বুক স্টল কলকাতা - ৯, ১ম সং ১৯৮১
৭. কলিকাতা দর্পণ ১ম খণ্ড, রাধারমণ মিত্র, সুবর্ণরেখা
৮. কলিকাতা সেকালের ও একালের, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, পি.এম. বাগচী এণ্ড কোং, ১৯৮৫
৯. প্রাচীন কলিকাতা; সম্পা, নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়। সাহিত্যলোক, ১৩৯০
১০. সহযোগ, স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৯৭, প্রবন্ধ-কেটি বিশেষ প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়, কিছু ভাবনা; অজয় মজুমদার ও লিয় বসু
১১. সরস্বতীর ইতর সন্তান, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়; অনুষ্টুপ
১২. Calcutta the City Revealed; Geoffrey Moorhouse, Penguin Books, 1994, ed.
১৩. Calcutta Slums Public Policy in Retrospect; Maitreyee Bardhan Roy, Minerva Associates P. Ltd.1994.
১৪. Calcutta the Profile of a City; Nishit Ranjan Ray, K P Bagchi & Co. 1986
১৫. Calcutta২০০ ভ্তব্রজব্দজ্ঞ ট ব্রপ্তপ্তভ্তব্ধভ্তন্ব্ধন্দ্ব ট্রপ্তত্ত ত্নন্দ্বজস্নান্দ্বন্তব্ধন্লন্দ্ব, ত্ব ন্ ভ্রুন্তস ছড্রস্তগ্ন, ত্নভ্তুপ্প ন ন্, ১৯৮১
১৬. Urban Poor & Urban Informal Sector, Abdul Aziz; উব্দড়ন্দড়, ত্ব. Delhi, 1984
১৭. Calcutta : People & Empire, Nimai S. Bose; India Book Exchange, 1975

১৮. The Urban Poor: Slum & Pavement Dwellers in the Major Cities in India, M A Singh & Alfred De Souza, Manohar, New Delhi, 1980
১৯. Calcutta: Old and New, H E A Cotton, Calcutta, 1907
২০. Calcutta in the 20th Centry An Urban Disaster/ Manimanjuri Mitra; Asiatic Book Agency, 1990
২১. Calcutta The Living City, Volume I & II Ed. Sukanta Chaudhuri, Oxford University Press
২২. Census Report – 2001
২৩. City of Joy. Dominic Lappire
২৪. সাবেক কলকাতার রাস্তার ইতিহাস, ১ম ও ২খণ্ড; সমীর রায়চৌধুরী,
২৫. কলকাতা তিন শতক, কৃষ্ণ ধর তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
২৬. Censns Report – 2001
২৭. City of Joy. D. L.
২৮. সাবেক কলকাতার রাস্তার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড; সমীর রায় চৌধুরী,
২৯. কোলকাতা তিন শতকের, কৃষ্ণ ধর তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
৩০. Mother Teresa, the Final Verdict\ Dt. Aroop Chaterjee
৩১. Paper on Centrally Sponsored Scheme: Panchayat & Rural Development Department. Govt.
৩২. NABARD Stats Focus Paper. West Bengal 2005 – 2006

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com